Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমাদের কিরূপ দ্বায়ী হওয়া উচিত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 23091020976

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমাদের কিরূপ দ্বায়ী হওয়া উচিত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 23091020976

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আমাদের কিরূপ দ্বায়ী হওয়া উচিত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস, আইডিঃ 23091020976 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আমাদের কিরূপ দ্বায়ী হওয়া উচিত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

জান্নাতুল ফেরদৌস

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

জান্নাতুল ফেরদৌস

আইডিঃ 23091020976

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

অধ্যায় ১: আমরা কেন দ্বায়ী হবো 6

১.১ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ 7

১.২ আল্লাহ তাআলার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য 9

১.৩ রাসূল ﷺ এর দায়িত্ব ছিল দাওয়াত দান 9

১.৪ দাওয়াতে সফলতার আশ্বাস...10

১.৫ সাহাবায়ে কিরামদের অনুকরণ করে দাওয়াত দান...11

অধ্যায় ২ : দাওয়াতের মূলনীতি...13

২.১ নিজেকে ঠিক করা..14

২.২ অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা..15

২.৩ ব্যক্তিগত ও সমন্বিত প্রচেষ্টা..16

২.৪ নবী-রাসূলদের দাওয়াতী পদ্ধতি অনুসরণ..17

২. ৫ সহানুভূতি ও দায়বদ্ধ দাওয়াতি মনোভাব 19

অধ্যায় ৩: দ্বায়ীকে যেমন হতে হবে 21

৩.১ সচেতন ও সতর্ক থাকা 22

৩.২ ধৈর্যশীল হওয়া...23

৩.৪ দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া...25

৩.৫ সত্যবাদী হওয়া...26

৩.৬ জাগতিক কুপ্রভাত থেকে মুক্ত 27

অধ্যায় ৪: দ্বায়ীর বৈশিষ্ট্য 29

৪.১ হিকমাহ অবলম্বনকারী হওয়া..30

৪.২ উত্তম উপদেশ দানের অধিকারী হওয়া..31

৪.৩ টার্গেটকৃত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মানসিকতার প্রতি নজর দেওয়া...............................32

৪.৪ দাওয়াতকে সহজ করে পেশ করা 34
৪.৫ কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য থাকা 35
৪.৬ বিনয়ের সহিত দাওয়াত দেওয়া 37
৪.৭ বুদ্ধিমত্তার সহিত দাওয়াত দেওয়া 39
৪.৮ কঠোর পরিশ্রম করা 41
৪.৯ উদার মন-মানসিকতা প্রকাশ করা 42
৪.১১ কারো বিরুদ্ধে বা কাউকে ছোট করে কথা না বলা 45
৪.১২ পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে দাওয়াত দেওয়া 46
৪.১৩ তাড়াহুড়ো পরিহার করা 49
৪.১৪ অন্য দ্বায়ীদের দোষ প্রচার না করে ইতিবাচক প্রশংসা করা 50
৪.১৫ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা রাখা 51
অধ্যায় ৫: দ্বায়ীর করণীয় 53
৫.১ পরিবার থেকে দাওয়াতি কাজ শুরু করা 54
৫.২ আমলের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া 56
৫.৩ আন্তরিকতা প্রকাশ করা 57
৫.৪ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা 59
৫.৫ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা 60
৫.৬ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা 61
৫.৭ বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা 63
অধ্যায় ৬ : দ্বায়ীর সফলতা লাভের উপায় 65
৬.১ ইখলাস (নিষ্কলুষ নিয়ত) 65
৬.২ আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা 66
৬.৩ শার’ঈ জ্ঞানে পারদর্শী হওয়া 68
৬.৪ বিদআত, পাপাচার ও গোমরাহীর মজলিস ত্যাগ করা 69

৬.৫ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দ্বারা সূচনা করা......70
৬.৬ নিকট আত্মীয়দের থেকে শুরু করা......71
৬.৮ নির্দিষ্ট এলাকা বা স্তরে দাওয়াত সীমাবদ্ধ না করা......72
৬.৯ দাওয়াত প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট হওয়া......74
অধ্যায় ৭: আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ......75
৭.১ অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার......76
৭.২ মোবাইল অ্যাপের প্রয়োগ......77
৭.৩ অনলাইন কন্টেন্ট তৈরি ও প্রচার......78
অধ্যায় ৮: যেসব বিষয় আদর্শ দ্বায়ী হতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়......79
৮.১ সঠিক পদ্ধতির অভাব......79
৮.২ উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিহীন পদ্ধতি......80
৮.৩ অস্পষ্টতা ও ভুল ধারণা......81
৮.৪ আক্রমণাত্মক ও বিতর্কিত আচরণ......82
৮.৫ সংগঠনের অভাব......83
৮.৬ ফতোয়াবাজি ও অহংকারী......83
অধ্যায় ৯ : দাওয়াতি কাজ না করলে যে শাস্তি হবে দুনিয়াতে ও আখিরাতে......84
৯.১ আল্লাহর অসন্তুষ্টি......85
৯.২ দোয়া কবুল না হওয়া......86
৯.৩ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অশান্তি......86
৯.৪ ঈমানের দুর্বলতা......87
৯.৫ জাহান্নামের কঠোর শাস্তি......87
উপসংহার......88

ভূমিকা

পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালার দরবারে অশেষ শুকরিয়া সাথে সাথে অসংখ্য দরুদ ও সালাম পেশ করছি, আমার পেয়ারা নবী ﷺ এর রওজায়ে আতহারে যার অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ তিতিক্ষার উসিলায় আল্লাহ তাআলা সারা জাহানে তার মনোনীত দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেহেতু মহান আল্লাহর নিকট মনোনীত দিন হচ্ছে ইসলাম ভাই প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব হলো এই দ্বীন তথা ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিযোগ করা। দাওয়াত অর্থ আহবান আর দ্বীনের পথে আহবানকারীকে দ্বীনের দ্বায়ী বলে। দ্বীনের দ্বায়ীর কিছু গুণ থাকা জরুরী। অন্যথায় , দাওয়াতের সুফল পাওয়া যাবে না। মুসলমানদের শিক্ষার অন্যতম বিষয় হলো কোরআন ও সুন্নাহ এর গভীর জ্ঞান অর্জন করা। কারণ নবীগণ উম্মতের ওলামাদের উপর নবুওতি দাওয়াত চালিয়ে যাওয়ার জন্য জিম্মাদারী দিয়ে গেছেন। দাওয়াতি কাজে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন সূরায় আল্লাহপাক নির্দেশনা দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

ط اُدْعُ اِلٰي سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

"তুমি তোমরা রবে দিকে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহবান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। (সূরা নাহল, ১২৫)।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন,
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَوَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

"আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত?আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু"- (সূরা হামিম আস সাজদাহ, ৩৩-৩৪)।

ইসলামের শত্রুরা সবসময় চেষ্টা করবে দ্বায়ীগনকে কষ্ট দেওয়ার জন্য, এগুলো দেখেও ধৈর্য ধারণ করতে হবে প্রতিশোধ পরায়ণ হওয়া যাবে না, তাকওয়ার খেলাফ কোন কাজ করা যাবে না, কঠোর ভাষা ব্যবহার করে ইসলামের বিষয়গুলোকে উল্টাপাল্টা বলে, সামান্য কারণে মুসলমান কে নাস্তিক, মুরতাদ আখ্যা দিয়ে অথবা ইসলামের বিষয়গুলোকে অতিরঞ্জিত করে

বলে, উম্মাহকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া দ্বায়ীর কাজ নয়। দ্বায়ী গনকে অবশ্যই হিকমাহ, ধৈর্য, তাকওয়া, কোমলতা, সত্যবাদিতা ও নিষ্ঠার সহিত দাওয়াতি কাজ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা যখন মুসা (আ:) ও হারুন (আ:) কে ফিরাউনের কাছে দ্বীন এর দাওয়াত এর নির্দেশ দিয়েছেন, তখন নির্দেশ দিয়েছিলেন নম্র ও কোমল ভাষা ব্যবহার করতে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করে একজন আদর্শ দ্বায়ী হওয়ার তাওফিক দান করুন।

অধ্যায় ১: আমরা কেন দ্বায়ী হবো

দ্বায়ী হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ একটি কাজ। একজন দ্বায়ী আল্লাহর পথে আহ্বান জানায়, মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের দিকে ডাকে এবং ইসলামের সঠিক বার্তা প্রচার করে। দাওয়াতের মাধ্যমে একজন দ্বায়ী সমাজে শান্তি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করে। সে মানুষকে সৎ কাজে উৎসাহিত করে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়। দ্বায়ী হওয়ার মাধ্যমে একজন মুসলমান নিজের জীবনকেও ইসলামী আদর্শে গঠন করতে পারে এবং অন্যদেরও সেই পথে আহ্বান জানায়। এতে সমাজে নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। শত্রুতা ও বিদ্বেষের পরিবর্তে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে।

তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত দ্বায়ীর দায়িত্ব অনুভব করা এবং ইসলামের বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা। এই প্রচেষ্টাই দুনিয়ায় কল্যাণ ও পরকালে মুক্তির পথ প্রশস্ত করে।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা সৎকর্মের প্রতি দাওয়াত দিবে এবং অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করবে, আর তারাই হবে সফলকাম' (আলে ইমরান, ১০৪)।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিছু লোককে সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্মের নিষেধ করার জন্য বের হ'তে বলেছেন। তাই আলেম সমাজকেই এ মহান দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

আল্লাহ বলেন,
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর মুমিন পুরুষ ও নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করে, আর ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অভিশয় সম্মানিত ও মহাজ্ঞানী" (সুরা তওবা, ৭১)।

১.১ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক ও রাব্ব। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্য হলো তাঁর একক ইবাদত করা এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। কুরআনে আল্লাহ বলেন,
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

"আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি, শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।"(সূরা আদ-যারিয়াত, ৫৬)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মানুষ কেবল দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের জন্য সৃষ্টি হয়নি। বরং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও তাঁর আহ্বান মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া তার দায়িত্ব।
আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে নিয়োজিত করেছেন,
وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ

"আমি পৃথিবীতে এক প্রতিনিধি স্থাপন করব।"(সূরা আল-বাকারা, ৩০)

এই প্রতিনিধি হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা এবং অন্যদের সেই পথে আহ্বান জানানো।
দাওয়াতের কাজ তাই কেবল ইমামের নয়, বরং প্রতিটি ঈমানদারের। কারণ কুরআনে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেন,
كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

“তোমরা উত্তম জাতি, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো।” -(সূরা আলে ইমরান,১১০)

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মুমিনকে দাওয়াতের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন।
অর্থাৎ, দাওয়াত শুধু আলেমদের কাজ নয়, বরং সব মুসলমানের নৈতিক কর্তব্য। আল্লাহর নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَي النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰي صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ

“এটি একটি কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি , যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসো।”-(সূরা ইব্রাহীম, ১)

দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। এটি মানবজাতির জন্য কল্যাণ ও মুক্তির পথ। আল্লাহর আদেশ পালনেই নিহিত রয়েছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক শান্তি। যদি মানুষ আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে, তবে পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যখন মানুষ আল্লাহর আদেশ ভুলে যায়, তখন অরাজকতা ও অন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন, কিন্তু সেই ইচ্ছা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করাই ঈমানের দাবি। তাই দাওয়াত হলো সেই মাধ্যম, যার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে আহ্বান করা হয়। দাওয়াতের কাজ আসলে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ প্রকাশ। কারণ দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে জান্নাতের পথে ডাকা হয়। এটি আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলোর একটি। তাই যিনি আল্লাহর আদেশ মেনে মানুষকে সত্যের পথে ডাকেন, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হন। দাওয়াত শুধু মুখের কথা নয়, এটি কর্ম ও আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।
একজন দ্বায়ী যখন সত্যিকারভাবে আল্লাহর নির্দেশ মেনে জীবনযাপন করে, তখন তার প্রতিটি কাজই দাওয়াত হয়ে যায়। আল্লাহর নির্দেশ মানা মানেই দাওয়াতের পথে অগ্রসর হওয়া। দাওয়াত হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ, আর ভালোবাসা থেকেই দায়িত্ববোধ জন্মায়। তাই দাওয়াত কেবল একটি ধর্মীয় কাজ নয়, বরং এটি ঈমানের স্বাভাবিক দাবি। যিনি আল্লাহকে ভালোবাসেন, তিনি তাঁর বান্দাদেরও সেই ভালোবাসার দিকে আহ্বান করেন। এভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করে। আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি, ন্যায় ও দয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.২ আল্লাহ তাআলার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যেন তারা তাঁর দ্বীন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। দ্বীন মানে কেবল নামাজ, রোজা নয়, বরং পুরো জীবনব্যবস্থাকে আল্লাহর আদেশে পরিচালনা করা। আল্লাহ চান তাঁর দ্বীন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোক এবং মানুষ ন্যায় ও সত্যের পথে চলুক। দাওয়াতের কাজ সেই দ্বীন প্রতিষ্ঠারই অংশ। মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেই দ্বীনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।
আল্লাহ কুরআনে বলেন,

هُوَ الَّذِيٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَي الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ

তিনি তোমাদের পাঠিয়েছেন সেই রাসূল, যিনি সত্যসহ দ্বীন নিয়ে এসেছেন, যাতে তিনি একে সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী করেন (সূরা আত-তাওবা, ৩৩)

এই আয়াত প্রমাণ করে, ইসলাম শুধু একটি ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। দাওয়াতের মাধ্যমে সেই জীবনবিধানকে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। দাওয়াতের লক্ষ্য হলো মানুষকে আল্লাহর শাসনের অধীনে আনা, অন্য কোনো ইচ্ছার নয়।
দ্বীন প্রতিষ্ঠা ছাড়া সমাজে ন্যায়বিচার, শান্তি ও সমতা আসতে পারে না। যখন মানুষ আল্লাহর দ্বীন অনুসারে চলে, তখন তারা পরস্পরের প্রতি ন্যায় করে। দাওয়াত এই ন্যায়ের পথ দেখায় এবং মানুষকে আল্লাহর বিধানে আহ্বান জানায়। এ কারণেই প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব দাওয়াতের মাধ্যমে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা। দাওয়াতের কাজ আসলে সমাজে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের প্রস্তুতি। যখন মানুষ দ্বীনকে গ্রহণ করে, তখন অন্যায় ও পাপ স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের হৃদয়ে তাকওয়া ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পায়। দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। আর যারা এই কাজে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করেন।

১.৩ রাসূল ﷺ এর দায়িত্ব ছিল দাওয়াত দান

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও মানুষকে তাঁর পথে আহ্বান করা। তিনি কেবল বলেননি, বরং নিজের জীবন দিয়ে দাওয়াতের উদাহরণ স্থাপন করেছেন। রাসূল ﷺ মক্কা ও মদিনায় দীর্ঘ বছর ধরে মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করেছেন।

তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন, নানা ধরনের অবহেলা, অবজ্ঞা ও বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু তিনি কখনও দাওয়াতের কাজ থামাননি। এক হাদিসে রাসূল ﷺ বলেছেন ,
"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয় এবং অন্যকে পথ দেখায়, তার জন্য প্রতিটি ভালো কাজের মতো সওয়াব রয়েছে।" (সহীহ মুসলিম)

এই হাদিস দেখায় যে, দাওয়াতের কাজ আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মহৎ ও মর্যাদাপূর্ণ।

রাসূল ﷺ শুধু নিজের জন্য নয়, সবার কল্যাণের জন্য দাওয়াত করেছেন। তিনি কেবল মুসলমানদেরই নয়, অমুসলিমদেরও আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতেন। তার দাওয়াত ছিল সদয়, ধৈর্যশীল এবং প্রমাণসমৃদ্ধ। রাসূল ﷺ কখনও জোর বা বাধ্যবাধকতা ব্যবহার করেননি। তিনি মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা জাগানোর চেষ্টা করতেন।

হাদিসে আছে,
আমার উদাহরণ তোমাদের মধ্যে দাওয়াতকারীর মতো, যিনি খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে।" (সহীহ বুখারি)

এই হাদিস স্পষ্ট করে যে, দাওয়াতের দায়িত্ব শুধু প্রচার নয়, বরং মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতার উন্নয়নেরও।

রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে দাওয়াতের দায়িত্ব দেন। তাঁর সাহাবীরা তাঁর অনুকরণ করে ইসলামের বিস্তার ঘটিয়েছে। দাওয়াত ছিল তাদের জীবনের প্রধান কাজ। দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা পায়। রাসূল ﷺ-এর দাওয়াত ছিল ধাপে ধাপে, দৃঢ় পরিকল্পনা অনুযায়ী। তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক উন্নতির জন্য দাওয়াত দিতেন। তিনি কখনো হতাশ হননি, বরং আশা এবং ধৈর্য দিয়ে মানুষকে পথ দেখাতেন। দাওয়াতকারীর কাজই ছিল মানুষের কল্যাণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। এই কারণে, আমরা রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতের পথ অনুসরণ করে দায়িত্ব পালন করি। দাওয়াতকে শুধুমাত্র বক্তৃতা নয়, বরং কর্ম ও আচরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। রাসূল ﷺ-এর জীবন আমাদের দেখায়, সত্যিকারের দাওয়াত মানে নিষ্ঠা, ধৈর্য ও সদয় আহ্বান। তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করে আমরা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সফল হতে পারি।

১.৪ দাওয়াতে সফলতার আশ্বাস

আল্লাহ তাআলা দ্বায়ীর জন্য সফলতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মানুষের জন্য দাওয়াত দেয়, তার প্রচেষ্টা কখনও বৃথা যায় না।

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَي اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

“আর কে অধিক উত্তম তার কথা, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে , নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।” (সূরা ফুসসিলাত, ৩৩)

এই আয়াত স্পষ্ট করে যে, আল্লাহ দাওয়াতকারীর প্রচেষ্টাকে মূল্যায়ন করেন। দাওয়াতের সফলতা কেবল সংখ্যাগত নয়, বরং মানুষের হৃদয় পরিবর্তনেও প্রমাণিত হয়। এক হাদিসে রাসূল ﷺ বলেছেন ,
“যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মানুষের প্রতি দাওয়াত জানায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত প্রস্তুত করেন।” (সহীহ বুখারি)

এটি দেখায় দ্বায়ীর জন্য আখিরাতেও বিশাল সওয়াব রয়েছে। আল্লাহ দ্বায়ীর কাজকে নিজের পথে সাহায্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেন। দাওয়াতের মধ্যে ধৈর্য, সততা এবং ভালো উদ্দীপনা থাকতে হবে। যদি মানুষ এসব মানে, আল্লাহ তার প্রচেষ্টা সফল করবেন। দাওয়াত মানে শুধুই কথা বলা নয়, এটি চরিত্র ও জীবনযাত্রার মাধ্যমে উদাহরণ স্থাপন। সত্য ও ন্যায়িক জীবনের উদাহরণ দিয়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে হয়। আল্লাহর সাহায্য এবং বরকত থাকলে ছোট প্রচেষ্টাও বড় ফল দেয়। সফল দাওয়াত মানে মানুষ আল্লাহর নিকট ফিরে আসে। এতে সমাজে ন্যায়, শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন দাওয়াতকারী নিজের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি রাখলে, আল্লাহ তাকে কখনও নস্যাত করেন না। দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গেলে আল্লাহ কৃপা ও সফলতা দান করেন।

১.৫ সাহাবায়ে কিরামদের অনুকরণ করে দাওয়াত দান

রাসূল ﷺ-এর সাহাবীরা দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য উজ্জ্বল উদাহরণ। তারা প্রতিটি সুযোগে আল্লাহর দ্বীন প্রচারে নিবেদিত ছিলেন। সাহাবিরা দাওয়াতকে শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছেন। তারা মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করতেন। হাদিসে এসেছে ,
“যে তোমাদের মধ্যে অন্যদের জন্য উপকারী, সে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ।” (সহীহ মুসলিম)

এই হাদিস দেখায়, সাহাবায়ে কিরাম শুধু নিজের কল্যাণ নয়, সমাজের কল্যাণেও নিযুক্ত ছিলেন।

সাহাবিরা দাওয়াত দিতেন ধৈর্য এবং সদয় আচরণের মাধ্যমে। তারা কখনও হিংসা, রাগ বা জোর ব্যবহার করেননি। এটি আমাদের শেখায় যে, দাওয়াত মানে সদয় ও প্রমাণভিত্তিক আহ্বান। তাদের দাওয়াত সমাজে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছে। সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়ে মানুষকে দাওয়াত করতেন। তাদের জীবন ছিল নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং ত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত। তারা দেখিয়েছেন কিভাবে আল্লাহর পথে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করতে হয়। দাওয়াতের মাধ্যমে তারা সমাজে ন্যায়, শান্তি এবং আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাহাবাদের উদাহরণ আমাদের দেখায়, দাওয়াত মানে শুধু আহ্বান নয়, বরং জীবনযাত্রা ও চরিত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন। তাদের চরিত্র, আচরণ ও আন্তরিকতা মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করত। তারা নিজেরা যেমন নামাজ, রোজা ও তাকওয়ায় অগ্রগামী ছিলেন, তেমনি অন্যদেরও তাতে উৎসাহিত করতেন। তাদের দাওয়াতের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলাম আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।

সাহাবিদের মধ্যে আবু বকর (রা.) ছিলেন প্রথম দাওয়াতদাতা সাহাবি। তিনি নিজের দাওয়াতের মাধ্যমে উসমান (রা.), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) প্রমুখ বহু ব্যক্তিকে ইসলামে এনেছিলেন। উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর দাওয়াতের শক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি নির্ভয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন, “আজ থেকে আমি প্রকাশ্যে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করব।” এই সাহস ও দৃঢ়তা দাওয়াতের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

সাহাবিরা দাওয়াতের কাজে কষ্টকে উপভোগ করতেন। তারা জানতেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া জীবনের প্রকৃত সাফল্য নেই। তাদের দাওয়াতের মূলভিত্তি ছিল ত্যাগ, ধৈর্য এবং ঈমানের দৃঢ়তা। তারা কখনও সম্মান বা সম্পদের প্রত্যাশা করেননি, চেয়েছেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ

“আর যারা আমার পথে চেষ্টা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।”(সূরা আল-আনকাবূত, ৬৯)

এই আয়াত সাহাবিদের জীবনে বাস্তব হয়ে উঠেছিল। তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দেশে দাওয়াতের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। কেউ সিরিয়ায়, কেউ ইয়েমেনে, কেউ আবার পারস্যে গিয়েছিলেন ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিতে। তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে অগণিত মানুষ

ইসলামের আলোতে আলোকিত হয়। তারা প্রতিটি দেশে ইসলামকে ন্যায়, শান্তি ও মানবতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেন।

সাহাবিদের দাওয়াতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা যা বলতেন, তাই নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতেন। তাদের কর্ম ও চরিত্র এতই পবিত্র ছিল যে, মানুষ তাদের দেখে ইসলাম গ্রহণ করত। তাদের দাওয়াত প্রমাণ করেছিল, সুন্দর আচরণই সবচেয়ে বড় প্রচার। তারা দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজকের যুগে আমাদেরও উচিত সাহাবিদের সেই ত্যাগ, সাহস ও আন্তরিকতা অনুসরণ করা। তাদের দাওয়াতের ধৈর্য, সত্যনিষ্ঠা এবং আল্লাহনির্ভরতা আমাদের অনুপ্রেরণা হওয়া উচিত। যদি আমরা তাদের পথে চলি, তবে আমরাও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব। সাহাবায়ে কিরামরা ছিলেন দাওয়াতের জীবন্ত উদাহরণ, আর তাদের অনুসরণ করলেই দাওয়াত সফল হবে, ইনশাআল্লাহ।

অধ্যায় ২ : দাওয়াতের মূলনীতি

দাওয়াত হলো আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করার পবিত্র দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করতে হলে কিছু মূলনীতি অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ দাওয়াত কেবল মুখের কথা নয়, বরং এটি জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও উত্তম চরিত্রের সমন্বয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اُدْعُ اِلٰي سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۗ

"তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।"(সূরা আন-নাহল, ১২৫)

দাওয়াতের মূলনীতি মানুষকে সঠিকভাবে ইসলামের দিকে আহ্বান করার পথ দেখায়। যে দ্বায়ী নিজের মধ্যে এই নীতিগুলো ধারণ করে, তার দাওয়াত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বোত্তম দ্বায়ী , আর তাঁর দাওয়াতের প্রতিটি ধাপে এই নীতিগুলোর প্রকাশ দেখা যায়। তিনি ছিলেন জ্ঞানে গভীর, কথায় মিষ্টি, আচরণে কোমল, এবং দাওয়াতে ধৈর্যশীল।

দাওয়াতের মূলনীতি শেখা মানে কেবল বক্তব্য শেখা নয় , বরং দ্বায়ী র মন, চিন্তা ও আচরণ গঠন করা। একজন প্রকৃত দ্বায়ী নিজের জীবন দিয়েই মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্য দেখাতে পারেন। সাহাবায়ে কিরামরা এই মূলনীতিগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে দাওয়াতের

কাজে সফল হয়েছিলেন। আজও যদি মুসলমানরা সেই আদর্শ নীতিতে ফিরে আসে, তবে পৃথিবীতে ইসলামের আলো আরও প্রসারিত হবে।

২.১ নিজেকে ঠিক করা

দাওয়াতের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো নিজের সংশোধন। যে ব্যক্তি নিজে সৎ নয়, সে অন্যকে সৎ হতে আহ্বান করলে তার কথা প্রভাব ফেলবে না। দাওয়াত শুরু করতে হয় নিজের ভেতর থেকে , নিজের ঈমান, আমল ও নৈতিকতা পরিশুদ্ধ করা জরুরি। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও, অথচ নিজেদের কথা ভুলে যাও?"(সূরা আল-বাকারা, ৪৪)

এই আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে, দ্বায়ীর উচিত আগে নিজের চরিত্র গঠন করা। রাসূল ﷺ ছিলেন দাওয়াতের সর্বোত্তম উদাহরণ, কারণ তিনি যা বলতেন, নিজেই তা পালন করতেন। সাহাবিরা তার কাছ থেকে প্রথমে নিজেরা পরিবর্তিত হয়েছিলেন, তারপর অন্যকে আহ্বান করেছেন।
নিজেকে ঠিক করা মানে শুধু নামাজ বা রোজা নয়, বরং অন্তরকে পবিত্র করা, রাগ, অহংকার, লোভ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা। দ্বায়ীর মুখ ও হৃদয় এক হওয়া জরুরি ,যেন তার কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য না থাকে। যদি দ্বায়ী নিজেই গুনাহে নিমজ্জিত থাকে, তবে মানুষ তার দাওয়াত গ্রহণ করবে না। তাই আল্লাহর পথে কাজ করার আগে নিজের আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য।
রাসূল ﷺ বলেছেন ,
"মুমিন সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে।"(সহীহ বুখারি)

এই হাদিস দাওয়াতদাতার চরিত্রের মূল মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয়। নিজেকে ঠিক করা মানে দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত হওয়া , যেমন সৈনিক যুদ্ধের আগে নিজের অস্ত্র ধারালো করে। একজন আত্মশুদ্ধ দ্বায়ী সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, মানুষ তাকে অনুসরণ করে। তাই দাওয়াতের মূলভিত্তি হলো আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহভীতি।

২.২ অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা

দ্বায়ীগনকে অবশ্যই অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি কারণ এটি দাওয়াতি কাজের পদ্ধতি ও কৌশল উন্নত করতে সাহায্য করে এবং সফলতার হার বাড়ায়। অন্যদের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সে ভুলগুলা এড়িয়ে চলে, দাওয়াতি কাজে যারা সফল হয়েছেন তাদের কাছ থেকে সফলতার কৌশলগুলি গ্রহণ করে এবং মানুষের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দায়ী কে তার দাওয়াতী কাজে অগ্রসর হতে হবে।
আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ

"তুমি তাদের কাহিনিতে শিক্ষাগ্রহণ করো, যারা বুদ্ধিমান।"(সূরা ইউসুফ, ১১১)

এই আয়াত নির্দেশ করে, অতীতের অভিজ্ঞতা বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথনির্দেশ।
অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া মানে অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং প্রজ্ঞাপূর্ণ বিশ্লেষণ। কখন, কোথায়, কীভাবে কাজ করলে ফল পাওয়া যায়, সেটি বোঝাই দাওয়াতের কৌশল। অভিজ্ঞ দ্বায়ী রা সময়ের পরিবর্তন অনুযায়ী দাওয়াতের পদ্ধতি সাজান, মূল নীতি অপরিবর্তিত রেখেই। যে ব্যক্তি পূর্বের দ্বায়ী দের পথ থেকে শিক্ষা নেয়, সে ভুল পুনরাবৃত্তি করে না।
রাসুল বলেছেন,
"বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।"(তিরমিজি)
অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া মানে , সফল দ্বায়ী দের অনুকরণ ও ব্যর্থ দ্বায়ী দের ভুল থেকে সতর্ক থাকা। দাওয়াতের ইতিহাস আমাদের শেখায়, আত্মতুষ্টি ও অহংকার দাওয়াতের শত্রু। অন্যদিকে, বিনয় ও পরামর্শ গ্রহণই সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহ বলেন ,

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ۗ

"তাদের কথা শুনে যারা উত্তমটিই অনুসরণ করে, তারাই বুদ্ধিমান।"(সূরা আয-যুমার, ১৮)

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে, পরামর্শ, অভিজ্ঞতা ও যুক্তিসম্মত বোধই দাওয়াতের উৎকর্ষতা আনে।
অতএব, একজন দ্বায়ী র উচিত আগের দ্বায়ী দের অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন করা। তাদের কষ্ট, কৌশল, ধৈর্য ও সাফল্যের গল্প থেকে শিক্ষা নেওয়া। এভাবে দাওয়াতের কাজ আরও প্রজ্ঞাপূর্ণ,

বাস্তবসম্মত ও ফলপ্রসূ হয়। যে দ্বায়ী অতীতের শিক্ষা গ্রহণ করে, সে ভবিষ্যতের আলোকিত পথ নির্মাণ করে।

২.৩ ব্যক্তিগত ও সমন্বিত প্রচেষ্টা

দাওয়াতের কাজে সবচেয়ে প্রয়োজন ব্যক্তিগত আন্তরিকতা ও সমষ্টিগত সহযোগিতা। দাওয়াত এমন এক দায়িত্ব যা ব্যক্তিগতভাবে শুরু হয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব নিজের অবস্থান থেকে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা। আল্লাহ তাআলা বলেন ,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَي الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক দল থাকুক, যারা সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।”(সূরা আলে ইমরান, ১০৪)

এই আয়াতে আল্লাহ মুসলমানদেরকে দলগতভাবে দাওয়াতের কাজে অংশ নিতে উৎসাহিত করেছেন।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দাওয়াতের মূল শেকড়, আর সমষ্টিগত প্রচেষ্টা তার ডালপালা। একজন মানুষ নিজের পরিবার, বন্ধু ও প্রতিবেশীর মাঝে দাওয়াত দিতে পারে। অন্যদিকে, সমাজে বৃহত্তর পরিবর্তনের জন্য সংগঠিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে নিজ পরিবারের কাছে দাওয়াত শুরু করেন, এটি ছিল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। পরে তিনি সাহাবিদের নিয়ে একত্রে কাজ করেছেন, এটি ছিল সমন্বিত প্রচেষ্টা। এই দুই ধাপ মিলেই ইসলামের দাওয়াত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

দাওয়াতের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন আনে। একজন দ্বায়ীর একান্ত আলোচনা, ভালো ব্যবহার ও উদাহরণ অনেক সময় বক্তৃতার চেয়েও বেশি প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে, সংগঠিত প্রচেষ্টায় দাওয়াতের বার্তা বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তাই দাওয়াতের ক্ষেত্রে দুটোই অপরিহার্য , ব্যক্তিগত আমল ও দলগত কাজ। রাসূল ﷺ বলেছেন, “মুমিনরা এক দেহের মতো, যদি একটি অঙ্গ ব্যথা পায়, পুরো দেহ কষ্ট পায়।”(সহীহ মুসলিম)

এই হাদিস দাওয়াতের ঐক্যের ভিত্তি শেখায়।

দ্বায়ীরা যদি একে অপরের সহযোগী হয়, তবে সমাজে ইসলামের বার্তা আরও শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত দাওয়াত আমাদের চরিত্রের মাধ্যমে শুরু হয়। যেমন, একজন শিক্ষক ছাত্রদের সামনে আদর্শ হয়ে দাওয়াত দিতে পারেন। একজন ব্যবসায়ী তার সততার মাধ্যমে

দাওয়াতের দৃষ্টান্ত হতে পারেন। এইভাবে, প্রত্যেকে নিজের অবস্থান থেকেই দাওয়াতের ভূমিকা রাখতে পারে।

অন্যদিকে, সমষ্টিগত দাওয়াতের মাধ্যমে বৃহৎ সমাজ পরিবর্তন সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, দলীয় ঐক্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা। দাওয়াতি সংগঠন বা জামে'আতগুলো যদি একে অপরের সহায়ক হয়, ইসলামী সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪

"তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, আর বিভক্ত হয়ো না।"(সূরা আলে ইমরান,১০৩)

এই আয়াতে দলগত ঐক্যের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ দাওয়াতের মূল চেতনা প্রকাশ করে। যে সমাজে দ্বায়ীরা ঐক্যবদ্ধ, সেখানে ইসলাম শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যেখানে বিভেদ, সেখানে দাওয়াত দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই ব্যক্তিগত আন্তরিকতা যেমন জরুরি, তেমনি পারস্পরিক সহযোগিতা ও একতা আরও জরুরি। দাওয়াতের কাজে একে অপরকে সাহায্য করা, ভুলত্রুটি ক্ষমা করা এবং সৎ উদ্দেশ্যে একসাথে চলাই সাফল্যের চাবিকাঠি। একজন মানুষ হয়তো একটি হৃদয়ে প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু একদল মানুষ পুরো জাতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ব্যক্তিগত ও সমন্বিত প্রচেষ্টার সমন্বয়ই ইসলামী দাওয়াতের মূল শক্তি।

২.৪ নবী-রাসূলদের দাওয়াতী পদ্ধতি অনুসরণ

নবী- রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বায়ী । তাদের দাওয়াতের পদ্ধতিই দাওয়াতের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। প্রত্যেক নবী নিজের জাতিকে তাদের ভাষায়, সংস্কৃতি অনুযায়ী এবং প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে আহ্বান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার জাতির ভাষায় প্রেরণ করেছি, যাতে সে তাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝাতে পারে।"(সূরা ইবরাহিম, ৪)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, দাওয়াতের মূলনীতি হলো সহজভাবে, মানুষের বোঝার ভাষায় কথা বলা।

নবীগণ কখনো কঠোরতা প্রদর্শন করেননি, বরং কোমলতা ও দয়ার মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান করেছেন। নবী নূহ (আ.) দীর্ঘ ৯৫০ বছর মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন ধৈর্যের সঙ্গে। তিনি দিনে ও রাতে, গোপনে ও প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছেন। তার দাওয়াত আমাদের শেখায়, ধৈর্য ও অবিরাম প্রচেষ্টা ছাড়া দাওয়াতের সফলতা আসে না।
নবী ইব্রাহিম (আ.) যুক্তির মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি তার জাতিকে বলেছিলেন,
قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ۙ

"তোমরা কি সেই জিনিস উপাসনা করো, যা তোমরা নিজেরা তৈরি করেছ?"(সূরা আস-সাফফাত, ৯৫)

তার দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তি, বাস্তবতা ও চিন্তায় উদ্রেক সৃষ্টি করা।
নবী মূসা (আ.)-এর দাওয়াতের ধরনও শিক্ষণীয়। তিনি ফেরাউনের মতো কঠোর শাসকের কাছেও কোমল ভাষায় আহ্বান করেছেন। আল্লাহ তাঁকে বলেছিলেন ,
فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ

"তার সঙ্গে কোমলভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে।"(সূরা ত্ব-হা, ৪৪)

এ থেকে আমরা শিখি– দাওয়াতে রাগ নয়, কোমলতা ও সহানুভূতিই কার্যকর। নবী ইউসুফ (আ.) কারাগারের মধ্যেও দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি কষ্টের মধ্যেও মানুষের প্রতি দয়া দেখিয়েছেন এবং তাওহিদের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর দাওয়াত শেখায় , অবস্থার কষ্ট কখনও দাওয়াতের পথে বাধা নয়।
রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সব নবীর মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বোত্তম দ্বায়ী । তিনি তাঁর দাওয়াতে কোমলতা, প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের অসাধারণ উদাহরণ রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উদ্দেশ করে বলেন ,
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪

"তুমি আল্লাহর অনুগ্রহেই তাদের প্রতি কোমল হয়েছ, যদি তুমি কঠোর ও রূঢ় হতে, তারা তোমার কাছ থেকে সরে যেত।"(সূরা আলে ইমরান, ১৫৯)

রাসূল ﷺ-এর দাওয়াত ছিল বাস্তবমুখী, মানুষকেন্দ্রিক এবং হৃদয়গ্রাহী। তিনি কখনও হঠাৎ কাউকে তিরস্কার করতেন না, বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী উপদেশ দিতেন। তিনি ভালোবাসা, সহানুভূতি ও নৈতিকতার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করেছেন। সাহাবীরা এই

নববী পদ্ধতিই অনুসরণ করে বিশ্বজুড়ে দাওয়াতের কাজ ছড়িয়ে দেন। তারা মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন, কথায় না গিয়ে কাজে দাওয়াত দেখাতেন। নবীদের পদ্ধতি অনুসরণ মানে – জ্ঞান, ধৈর্য, দয়া ও প্রজ্ঞার সমন্বয় ঘটানো। যে দ্বায়ী নবী–রাসূলদের দাওয়াতি আদর্শে চলে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে।

আল্লাহ বলেন ,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।”(সূরা আল-আহযাব, ২১)

এই আয়াত দাওয়াতের প্রতিটি পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

অতএব, নবী–রাসূলদের দাওয়াতি পদ্ধতি অনুসরণই দাওয়াতের সাফল্যের নিশ্চয়তা।

২. ৫ সহানুভূতি ও দায়বদ্ধ দাওয়াতি মনোভাব

দাওয়াতের মূল চালিকাশক্তি হলো সহানুভূতি ও দায়বদ্ধ মনোভাব। যে দ্বায়ী মানুষের প্রতি মমতা ও দয়া রাখে, তার দাওয়াত মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। দাওয়াত মানে শুধু কথার মাধ্যমে আহ্বান নয়, বরং ভালোবাসা ও দুঃখবোধের সঙ্গে মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ জাতির প্রতি গভীর সহানুভূতি ও দায়বদ্ধতা অনুভব করতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে বলেন,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

“তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, তোমাদের কষ্ট তাঁর কাছে কষ্টদায়ক, তিনি তোমাদের মঙ্গল কামনা করেন এবং মুমিনদের প্রতি দয়ালু ও দয়াময়।”(সূরা আত-তাওবা,১২৮)

এই আয়াত রাসূল ﷺ-এর দাওয়াতি মনোভাবের সারাংশ প্রকাশ করে।

তিনি মানুষকে ধমক দিয়ে নয়, বরং ভালোবাসা দিয়ে পরিবর্তন করতেন। সহানুভূতি ছাড়া দাওয়াতের কথা শুষ্ক হয়ে যায়, আর দয়া ছাড়া দাওয়াত মানুষের মনে প্রভাব ফেলে না। একজন সত্যিকারের দ্বায়ী মানুষের ভুল দেখলে ঘৃণা নয়, বরং দুঃখ অনুভব করেন। তিনি

চান মানুষ যেন ভুল থেকে ফিরে আসে এবং মুক্তির পথে চলে। এই মনোভাবই দাওয়াতকে আন্তরিক ও কার্যকর করে তোলে। রাসূল ﷺ তায়েফে যখন মানুষ তাঁকে অপমান করল, তখনও তিনি তাদের জন্য দোয়া করলেন। তিনি বললেন ,

"হে আল্লাহ, এরা জানে না, তাই ক্ষমা করুন।"

এই দোয়া ছিল দাওয়াতের সর্বোচ্চ সহানুভূতির উদাহরণ।

সহানুভূতি মানে দাওয়াতের কষ্টকেও আনন্দের মতো গ্রহণ করা। দ্বায়ী যদি মানুষের প্রতিক্রিয়ায় হতাশ না হয়ে তাদের কল্যাণের চিন্তা করে, তবে তার দাওয়াত ফলপ্রসূ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন ,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

"তুমি নিশ্চয়ই তাদের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহে নিজের প্রাণ প্রায় বিলিয়ে দিচ্ছো, কারণ তারা বিশ্বাস করছে না।" (সূরা আশ-শু'আরা, ৩)

এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশ করে, যা এক দ্বায়ীর প্রকৃত দায়বোধের নিদর্শন। দাওয়াতি সহানুভূতির অর্থ হলো মানুষকে উপহাস না করা, বরং তাদের অবস্থান বুঝে আহ্বান করা। দ্বায়ীর কাজ হলো মানুষকে দূরে ঠেলে দেওয়া নয়, বরং কাছে টেনে নেওয়া। যে দ্বায়ী মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল, তার দাওয়াত হৃদয় ছুঁয়ে যায়। দায়বদ্ধ দাওয়াতি মনোভাব মানে দায়িত্ববোধের সঙ্গে কাজ করা। একজন দ্বায়ী জানে সে শুধু নিজের নয়, বরং সমাজ ও উম্মতের দায় বহন করছে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

"তোমাদের প্রত্যেকেই একজন রক্ষণাবেক্ষক, এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীস প্রমাণ করে, দাওয়াত কোনো ঐচ্ছিক কাজ নয়, বরং এটি এক আমানত।

যে দ্বায়ী এই দায়িত্ব উপলব্ধি করে, সে কখনো দাওয়াতের ময়দান ছেড়ে যায় না। সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ দাওয়াতের দুটি চাকা। একটি ছাড়া অন্যটি পূর্ণ হয় না। যে দ্বায়ীর হৃদয়ে দয়া নেই, তার দাওয়াতে বরকত আসে না। আর যে দ্বায়ী দায়িত্বহীন, তার দাওয়াত টেকে না। একজন দ্বায়ীকে তাই নিজের ভেতর সহানুভূতি, ধৈর্য, এবং দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে হবে। তখনই তার দাওয়াত হবে ফলপ্রসূ, আন্তরিক ও আল্লাহর সন্তুষ্টিদায়ক। আল্লাহর প্রেরিত নবী–রাসূলদের মতো হৃদয়বান দ্বায়ীরাই পৃথিবী পরিবর্তন করে।

অধ্যায় ৩: দ্বায়ীকে যেমন হতে হবে

দাওয়াতের কাজ শুধু মুখের কথা নয়, বরং এটি এক মহান দায়িত্ব ও আমানত। যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে, তাকে হতে হয় চরিত্রে, চিন্তায় ও আচরণে আল্লাহভীরু। একজন দ্বায়ীর জীবনই হলো তার দাওয়াতের সবচেয়ে শক্ত প্রমাণ। যদি দ্বায়ীর জীবন আদর্শ না হয়, তবে তার কথা মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলবে না। দাওয়াতের সফলতা শুরু হয় নিজের ভেতর থেকে। প্রথমে নিজেকে দ্বীনের আলোয় গড়ে তুলতে হয়, তারপর সেই আলো অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে নিজে কুরআনের আদর্শে গড়ে উঠেছিলেন, তারপর অন্যদের আহ্বান করেছিলেন। তিনি ছিলেন জীবন্ত কুরআন। যেমন আয়েশা (রা.) বলেছেন,

"তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।" (সহীহ মুসলিম)

একজন দ্বায়ীর মধ্যে থাকতে হবে তিনটি মৌলিক গুণ জ্ঞান, ধৈর্য ও দয়া। সে যেন জ্ঞানে দৃঢ়, আচরণে নম্র এবং হৃদয়ে সহানুভূতিশীল হয়। দ্বায়ীর জ্ঞান তাকে পথ দেখায়, ধৈর্য তাকে দৃঢ় রাখে, আর দয়া তাকে মানুষের কাছে প্রিয় করে তোলে। একজন দ্বায়ীর আহ্বান হতে হবে জ্ঞানভিত্তিক, কোমল ও সুচিন্তিত। একজন দ্বায়ীকে হতে হবে সময় সচেতন ও বাস্তবতাবোধসম্পন্ন। সে যেন জানে কোন পরিবেশে কোন কথা উপযুক্ত, কার সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে।

দাওয়াত কখনও জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং মানুষকে ভালোবাসার মাধ্যমে সত্যের পথে ডেকে আনা। রাসূল ﷺ বলেছেন ,

"তোমরা মানুষের প্রতি সহজ করো, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, বিমুখ করো না।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীস দাওয়াতের মূলনীতি শিখিয়ে দেয় কোমলতা ও ইতিবাচকতা।

একজন দ্বায়ীর চরিত্র হতে হবে পরিচ্ছন্ন ও বিশ্বস্ত। সে যেন তার কথা ও কাজে সত্যবাদী, আমানতদার ও বিনয়ী হয়। মানুষ যেন তার জীবন দেখে ইসলামের সৌন্দর্য চিনতে পারে। কারণ, কখনও একটি আদর্শ চরিত্র হাজার বক্তৃতার চেয়েও বেশি দাওয়াতের প্রভাব ফেলে। দ্বায়ীর মধ্যে থাকতে হবে সাহস ও আত্মসমর্পণের ভারসাম্য। সাহস সত্য বলার জন্য, আর আত্মসমর্পণ আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি। সে জানে, তার কাজ শুধু দাওয়াত দেওয়া, হিদায়াত দেওয়া আল্লাহর হাতে। আল্লাহ বলেন ,

اِنَّكَ لَا تَهۡدِیۡ مَنۡ اَحۡبَبۡتَ وَلٰکِنَّ اللّٰهَ یَهۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ ۚ

"তুমি কাউকে হিদায়াত দিতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকেই হিদায়াত দেন।"(সূরা আল-কাসাস,৫৬)

অতএব, একজন দ্বায়ীকে হতে হবে জ্ঞানী, সচেতন, ধৈর্যশীল, দয়ালু ও আদর্শবান। যে নিজের জীবনে ইসলামকে ধারণ করে, সেই প্রকৃত অর্থে অন্যকে ইসলামের পথে আহ্বান করতে পারে। দাওয়াতের মূল সৌন্দর্য দ্বায়ীর চরিত্রেই ফুটে ওঠে।

৩.১ সচেতন ও সতর্ক থাকা

দাওয়াতের পথে একজন দ্বায়ীর সবচেয়ে প্রয়োজন সচেতনতা ও সতর্কতা। কারণ দাওয়াত হলো এমন এক কাজ, যেখানে সামান্য অসাবধানতা বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। একজন দ্বায়ীকে শুধু কথা বলতে জানলেই হয় না, কখন, কোথায়, কাকে এবং কীভাবে বলতে হবে , তা জানতে হয়। একজন দ্বায়ীকে সবসময় বুঝতে হবে, তার প্রতিটি কথা মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলতে পারে। যদি সে অসচেতনভাবে কঠোর কথা বলে, তবে মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াতের সময় সবসময় পরিস্থিতি ও মানুষের মানসিকতা বুঝে কথা বলতেন। তিনি বলেছেন,
"মানুষের বুদ্ধির পরিমাণ অনুযায়ী তাদের সঙ্গে কথা বলো।" (সহীহ মুসলিম)
অর্থাৎ, সবাইকে একইভাবে নয়, তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দাওয়াত দিতে হবে।
সচেতন দ্বায়ী জানে কখন কথা বলতে হবে, আর কখন চুপ থাকাই উত্তম। তিনি এমনভাবে কথা বলেন, যাতে দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হয়, বিতর্ক নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,
وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا

"যদি তারা অজ্ঞতার কারণে কিছু বলে, তবে তুমি বলো , সালাম, তোমাদের উপর শান্তি।"(সূরা আল-ফুরকান, ৬৩)

এই আয়াত শেখায়, দ্বায়ীকে অজ্ঞ লোকদের সঙ্গে বিতর্কে জড়ানো নয়, বরং শান্ত থাকতে হয়।
একজন দ্বায়ীর সতর্কতা তার ধৈর্য, মেধা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সচেতন দ্বায়ী আগে নিজের কথা চিন্তা করে, তারপর বলে। সে জানে তার প্রতিটি কথা আল্লাহর সামনে হিসাবের আওতায় আসবে। রাসূল ﷺ বলেছেন,
"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)
দাওয়াতে সতর্কতা মানে কৌশলগতভাবে কাজ করা। কখন কঠোরতা দরকার, কখন কোমলতা তা বোঝা জরুরি। যেমন, রাসূল ﷺ কখনো কঠোরভাবে কুফরি নিন্দা করেছেন,

আবার অনেক সময় ক্ষমা ও দয়া দেখিয়েছেন। সচেতন দ্বায়ী সমাজের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। সে জানে কার কী সমস্যা আছে, এবং কীভাবে তাকে ইসলামের পথে আনতে হবে। অন্ধভাবে প্রচার নয়, বরং হৃদয় বুঝে আহ্বান করাই প্রকৃত দাওয়াত।
দাওয়াতের সময় সতর্ক দ্বায়ী গোপনীয়তার দিকেও খেয়াল রাখে। কখনও কিছু বিষয় প্রকাশ্যে বলা উপযুক্ত নয়, সে বিষয়গুলো ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করে। এভাবেই সে মানুষের সম্মান রক্ষা করে এবং তাদের মন জয় করে নেয়। একজন অসতর্ক দ্বায়ী অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। কিন্তু সচেতন দ্বায়ী মানুষকে কাছে আনে, ভালোবাসা ও সহানুভূতির মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটায়। সচেতন দ্বায়ী কখনো নিজের অহংকারে ভোগে না, বরং আল্লাহর ভয় ও দায়িত্ববোধে পরিচালিত হয়। সে জানে তার দাওয়াত সফল হলে তাতে কৃতিত্ব আল্লাহর, আর ব্যর্থ হলে সে নিজের সংশোধন দেখে। অতএব, একজন দ্বায়ীর উচিত নিজের কথা, কাজ, ও আচরণে সবসময় সচেতন ও সতর্ক থাকা। সে যেন দাওয়াতের বার্তাকে বিকৃত না করে, বরং প্রজ্ঞা ও ভারসাম্যের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দেয়।

৩.২ ধৈর্যশীল হওয়া

দাওয়াতের পথে ধৈর্য হলো দ্বায়ীর সবচেয়ে বড় অস্ত্র। কারণ দাওয়াতের কাজ কখনো সহজ নয়, এতে আসে বাধা, বিরোধিতা, কষ্ট ও পরীক্ষা। যে দ্বায়ী ধৈর্য ধরে এগিয়ে চলে, আল্লাহ তার জন্য সফলতার দরজা খুলে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ

“তুমি ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।”(সূরা আল-আনফাল, ৪৬)

ধৈর্য মানে কেবল কষ্ট সহ্য করা নয়, বরং দৃঢ়তার সঙ্গে দাওয়াত চালিয়ে যাওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ ধৈর্যের সর্বোত্তম উদাহরণ ছিলেন। তিনি মক্কার মানুষদের হাতে অপমানিত, নির্যাতিত হয়েছেন, তবু কখনো হতাশ হননি। তায়েফের পাথরের আঘাতেও তিনি দোয়া করেছিলেন, “হে আল্লাহ! তারা জানে না, তাই তাদের ক্ষমা করো।”
দ্বায়ীর ধৈর্য হলো তার বিশ্বাসের প্রমাণ। যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, সে জানে প্রতিটি কষ্টের পর আছে প্রশান্তি। আল্লাহ বলেন,

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؕ

“নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি।”(সূরা আশ-শারহ, ৬)

দাওয়াতের কাজে মানুষ কখনো প্রশংসা করবে, কখনো সমালোচনা করবে। একজন ধৈর্যশীল দ্বায়ী প্রশংসায় গর্বিত হয় না, আর নিন্দায় ভেঙে পড়ে না। সে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে যায়। রাসূল ﷺ বলেছেন,

“মুমিনের অবস্থা আশ্চর্যজনক, তার প্রতিটি অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর।” (সহীহ মুসলিম)

এই হাদীস শেখায়, দ্বায়ীর জন্য কষ্টও আল্লাহর রহমত হতে পারে, যদি সে ধৈর্য ধরে।

ধৈর্য দ্বায়ীকে পরিণত করে নম্র, চিন্তাশীল ও আত্মসংযমী মানুষে। যে ধৈর্যশীল, সে কথা বলার আগে ভাবে, প্রতিক্রিয়ার আগে বুঝে নেয়। তার মুখে রাগ নয়, বরং দয়া ও প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটে।

নবী নূহ (আ.) প্রায় ৯৫০ বছর দাওয়াত দিয়েছেন। এটি ধৈর্যের সর্বোচ্চ উদাহরণ। তিনি কখনো ক্লান্ত হননি, বরং মানুষকে আবার আহ্বান করেছেন আল্লাহর পথে। এই ইতিহাস প্রতিটি দ্বায়ীকে শেখায়, সত্যের পথে কখনো হাল ছেড়ে দেওয়া যায় না। ধৈর্যহীন দ্বায়ী দ্রুত হতাশ হয়, আর হতাশা শয়তানের ফাঁদ। কিন্তু ধৈর্যশীল দ্বায়ী জানে দাওয়াতের ফল তৎক্ষণাৎ না আসলেও, আল্লাহ তা গোপনে লিখে রাখেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیۡعُ اَجۡرَ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ۙ

সৎ কাজ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মীদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।”(সূরা আত-তাওবা, ১২০)

দাওয়াতের পথে ধৈর্য মানে হলো নিজের আমল ঠিক রাখা, প্রতিকূলতার মধ্যেও ইতিবাচক থাকা। মানুষ যদি অবজ্ঞা করে, দ্বায়ী তবু দোয়া করে। মানুষ যদি দূরে সরে যায়, সে তবুও ভালোবাসা দিয়ে আহ্বান করে। ধৈর্য দ্বায়ীর হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে, অহংকারকে দূর করে এবং তাকে আল্লাহর নিকটে প্রিয় করে তোলে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

“যে ধৈর্য ধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও বৃহত্তর দান কেউ পায় না।” (সহীহ বুখারী)

অতএব, একজন দ্বায়ীর জন্য ধৈর্য শুধু প্রয়োজন নয়, এটি তার জীবনের আবশ্যক গুণ। ধৈর্যশীল দ্বায়ীই মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। যে দ্বায়ী ধৈর্য ধরে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তার দাওয়াতের ফল আল্লাহর ইচ্ছাতেই আসবেই।

৩.৪ দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া

একজন দ্বায়ীর জন্য দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। কারণ, জ্ঞান ছাড়া দাওয়াত অন্ধের মতো চলার নামান্তর। যে নিজে জানে না, সে অন্যকে সঠিক পথে আহ্বান করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ

“বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?”(সূরা আয-যুমার, ৯)

দাওয়াতের কাজ একটি জ্ঞাননির্ভর দায়িত্ব। দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে দ্বায়ীর কথায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তাই প্রকৃত দ্বায়ীর উচিত কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও সীরাত বিষয়ে ক্রমাগত শিখতে থাকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
“যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।”(সহীহ মুসলিম)
দ্বীনী শিক্ষা দ্বায়ীকে আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা প্রদান করে। সে জানে, কীভাবে সত্য কথা বলতে হয়, কীভাবে মানুষের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। জ্ঞান দ্বায়ীকে অহংকারী নয়, বরং বিনয়ী করে তোলে। কারণ সে বুঝে আল্লাহর জ্ঞানের বিশালতা।
একজন অজ্ঞ দ্বায়ী ভালো উদ্দেশ্য নিয়েও ভুল দাওয়াত দিতে পারে। অন্যদিকে, জ্ঞানী দ্বায়ী কৌশল ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান একে অপরের পরিপূরক। জ্ঞান ছাড়া প্রজ্ঞা বিকশিত হয় না, আর প্রজ্ঞা ছাড়া জ্ঞান ফলপ্রসূ হয় না।
একজন শিক্ষিত দ্বায়ী জানে কখন কঠোর হতে হয়, কখন কোমল। রাসূল ﷺ-এর যুগে সাহাবারা দাওয়াতের আগে কুরআনের শিক্ষায় দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করতেন। তারা বলতেন, “আমরা দশটি আয়াত শিখতাম, সেগুলো আমল না করা পর্যন্ত পরবর্তী আয়াতে যেতাম না।” এই মনোভাবই তাদেরকে সফল দ্বায়ীতে পরিণত করেছিল। একজন দ্বায়ীর জ্ঞান কেবল বইয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার জীবনের প্রতিটি আচরণে প্রতিফলিত হয়। সে নিজে যেমন শেখে, তেমনই অন্যদের শেখায়। সে জানে, দাওয়াত শুধু মুখের কথা নয়, এটি শিক্ষার ধারাবাহিক প্রয়োগ।
দ্বীনী শিক্ষা দ্বায়ীর দাওয়াতকে সঠিক পথে রাখে। যে জানে আল্লাহর বিধান, সে মানুষকে সঠিকভাবে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে পারে। অজ্ঞ দ্বায়ী মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত দ্বায়ী মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত দ্বায়ীর হৃদয়

আল্লাহর ভয়ে পরিপূর্ণ থাকে। সে জ্ঞানকে কাজে পরিণত করে, মানুষকে অনুপ্রাণিত করে এবং নিজেও পরিবর্তিত হয়। সে বুঝে দাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে জান্নাতের পথে ডেকে আনা, বিতর্ক জেতা নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন ,

"তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।" (সহীহ বুখারী)

অতএব, একজন দ্বায়ীর প্রথম ও আজীবনের দায়িত্ব হলো দ্বীনী শিক্ষায় নিজেকে গড়ে তোলা। জ্ঞান ছাড়া দাওয়াত অসম্পূর্ণ, কিন্তু জ্ঞানের আলোয় দাওয়াতই মানবতার পথপ্রদর্শক। শিক্ষিত দ্বায়ীর দাওয়াত হৃদয়ে আলো জ্বালায়, সমাজে পরিবর্তন আনে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

৩.৫ সত্যবাদী হওয়া

একজন দ্বায়ীর জীবনের অন্যতম ভিত্তি হলো সত্যবাদিতা। দাওয়াতের কাজে সত্যই তার সবচেয়ে বড় শক্তি। যে দ্বায়ী সত্যের উপর দৃঢ় থাকে, তার দাওয়াত মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।" (সূরা আত-তাওবা, ১১৯)

দাওয়াতের পথে মিথ্যা বা ভণ্ডামি দ্বায়ীর মর্যাদা নষ্ট করে দেয়। মানুষ দ্বায়ীর কথা নয়, তার চরিত্র দেখে ইসলাম সম্পর্কে ধারণা পায়। যদি দ্বায়ীর কথায় ও কাজে পার্থক্য থাকে, তার দাওয়াত ফলপ্রসূ হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"সত্যবাদিতা মানুষকে নেক কাজের পথে পরিচালিত করে, আর নেক কাজ মানুষকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়।"

(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

সত্যবাদিতা শুধু মুখের কথা নয়, এটি চিন্তা, আচরণ ও আমলের সমন্বয়। দ্বায়ী যেন এমন না হয় যে, নিজে কিছু করে না অথচ অন্যকে উপদেশ দেয়। আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

"তোমরা যা কর না, তা কেন বলো?"(সূরা আস-সাফ, ২)

দাওয়াতে সত্যবাদিতা মানে নিজের জীবনে দ্বীনের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো।সত্যবাদী দ্বায়ীর কথায় দৃঢ়তা থাকে, তার মুখে বিশ্বাসযোগ্যতা ফুটে ওঠে। রাসূল ﷺ-এর জীবনে সত্যবাদিতার অনন্য দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নবুয়ত লাভের আগেও তিনি "আল-আমিন" ও "আস-সাদিক" নামে পরিচিত ছিলেন। তার এই চরিত্রই মানুষকে তার দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। একজন দ্বায়ী যদি সত্যবাদী হয়, তার শত্রুও তাকে সম্মান করে। কিন্তু যদি সে মিথ্যাচার করে, তাহলে তার বন্ধুদেরও আস্থা নষ্ট হয়। সত্য দ্বায়ীকে স্থির রাখে, মিথ্যা তাকে দুর্বল করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন ,

وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

"যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা বিশ্বাস করেছে, তারাই মুত্তাকী।"(সূরা আয-যুমার, ৩৩)

দাওয়াতের ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা মানে সঠিক তথ্য প্রদান, ন্যায়বিচার করা এবং দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন না করা। দ্বায়ী কখনো জনপ্রিয়তার জন্য বা মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য মিথ্যা গল্প তৈরি করে না। সে জানে, আল্লাহর সন্তুষ্টি মানুষের সন্তুষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। রাসূল ﷺ বলেছেন, "সত্য বলো, যদিও তা তোমার বিরুদ্ধে যায়।"(ইবনু মাজাহ)
এই হাদীস শেখায়, দ্বায়ীর উচিত সত্যের পথে অটল থাকা, এমনকি তা তার জন্য কষ্টের হলেও।
সত্যবাদী দ্বায়ী আল্লাহর নিকট প্রিয় হয়, কারণ সে আল্লাহর গুণাবলির প্রতিফলন ঘটায় নিজের জীবনে। সত্যবাদিতা দ্বায়ীর দাওয়াতকে পরিশুদ্ধ করে, তার কথায় বরকত আনে। মানুষ তার জীবনের সততা দেখে ইসলামের সৌন্দর্য চিনে ফেলে। যেখানে মিথ্যা ছড়ায়, সেখানে দ্বায়ীর সত্যের আলো মানুষকে আশার দিশা দেখায়।
অতএব, একজন দ্বায়ীর প্রথম শর্ত হলো সত্যবাদী হওয়া। সত্যবাদিতা ছাড়া দাওয়াতের কোন মূল্য নেই। সত্যবাদী দ্বায়ীর জিহ্বা ও হৃদয় এক থাকে, তার কথাই তার আমল।এবং সেই সত্যই মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনে।

৩.৬ জাগতিক কুপ্রভাত থেকে মুক্ত

একজন দ্বায়ীর জন্য জাগতিক কু-প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, দাওয়াতের কাজ পবিত্র উদ্দেশ্যে করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, পার্থিব স্বার্থের জন্য নয়। যে দ্বায়ী জাগতিক মোহে আসক্ত হয়ে পড়ে, তার দাওয়াতের আন্তরিকতা হারিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

"এই দুনিয়ার জীবন তো কেবল খেলা ও আমোদ-প্রমোদের বস্তু, আর পরকালের ঘরই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।"(সূরা আনকাবুত, ৬৪)

দাওয়াত একটি আখিরাতমুখী কাজ, তাই এর সাথে দুনিয়ার স্বার্থ মেশানো বিপজ্জনক। দ্বায়ীর উচিত নাম, খ্যাতি বা সম্পদের লোভ থেকে দূরে থাকা। কারণ দাওয়াতের মূল্য মানুষের প্রশংসায় নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টিতে।রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"এই দুনিয়া হচ্ছে একটি মিষ্টি ও সবুজ জিনিস, আর আল্লাহ তোমাদের তাতে স্থলাভিষিক্ত করেছেন, যাতে দেখেন তোমরা কেমন কাজ করো।"(সহীহ মুসলিম)

এই হাদীস আমাদের শেখায় দুনিয়া মোহময় হলেও, একজন মুমিনকে সতর্ক থাকতে হবে। দ্বায়ীর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও মর্যাদার লালসা। যখন দাওয়াত খ্যাতির উপায় হয়ে যায়, তখন তা আর আল্লাহর পথে আহ্বান থাকে না। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰي لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا

"যে আখিরাত কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য চেষ্টা করে, তাদের প্রচেষ্টা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।"(সূরা আল-ইসরা, ১৯)

অতএব, দ্বায়ীর কাজ আখিরাতের উদ্দেশ্যে হতে হবে, দুনিয়ার লাভের জন্য নয়। সে যেন তার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ রাখে, যাতে শয়তান দাওয়াতের নামে তাকে বিভ্রান্ত না করতে পারে। জাগতিক প্রভাব থেকে মুক্ত দ্বায়ী-ই মানুষকে প্রকৃত ত্যাগ ও ঈমানের উদাহরণ দিতে পারে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

"দুনিয়া অভিশপ্ত, এবং দুনিয়ার সব কিছু অভিশপ্ত, তবে আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ, আলেম ও শিক্ষার্থী ব্যতীত।"(তিরমিজি)

এই হাদীস দ্বায়ীদের মনে করিয়ে দেয়, প্রকৃত মর্যাদা দুনিয়ায় নয়, বরং আল্লাহর কাছে। দ্বায়ী যেন সমাজের দৃষ্টিতে বড় না হতে চায়, বরং আল্লাহর কাছে প্রিয় হতে চায়। সে জানে, দাওয়াতের ফল আল্লাহর হাতে, মানুষের প্রশংসা বা অপছন্দ কোনো গুরুত্ব রাখে না। যখন দ্বায়ী দুনিয়ার প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকে, তখন তার কথা ও দাওয়াতে বরকত আসে। তার আন্তরিকতা মানুষকে আকৃষ্ট করে, কারণ মানুষ বুঝতে পারে, সে কোনো স্বার্থে নয়, শুধু আল্লাহর জন্য কথা বলছে। এই আন্তরিকতাই দাওয়াতের সাফল্যের গোপন রহস্য। আল্লাহ বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার পুরস্কার চায়, আমি তাকে তাতে দিই, আর যে আখিরাতের পুরস্কার চায়, আমি তাকে তাতেও দিই।"(সূরা আশ-শূরা, ২০)

একজন দ্বায়ীর জন্য এই আয়াত গভীর বার্তা বহন করে, লক্ষ্য ঠিক করতে হবে।যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাত দুই ই দেন। কিন্তু যে দুনিয়ার জন্য দাওয়াত দেয়, সে উভয় দিকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব, দ্বায়ীকে হতে হবে জাগতিক প্রভাবমুক্ত, পরিশুদ্ধ ও আখিরাতমুখী। তার মন থাকবে আল্লাহর দিকে, কাজ হবে সত্যের জন্য, উদ্দেশ্য হবে জান্নাতের জন্য। এমন দ্বায়ী-ই প্রকৃত অর্থে আল্লাহর পথের সৈনিক, যিনি পৃথিবীতে আলোর দিশা ছড়িয়ে দেন।

অধ্যায় ৪: দ্বায়ীর বৈশিষ্ট্য

দাওয়াত একটি মহৎ ও পবিত্র দায়িত্ব, যা আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণের জন্য দিয়েছেন। এই দায়িত্ব পালন করতে যে ব্যক্তি নিজেকে নিয়োজিত করে, তাকে বলা হয় দ্বায়ী। অর্থাৎ আল্লাহর পথে আহ্বানকারী। কিন্তু শুধু আহ্বান করলেই একজন মানুষ আদর্শ দ্বায়ী হয়ে যায় না। একজন প্রকৃত দ্বায়ীর মাঝে এমন কিছু বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক, যা তার দাওয়াতকে কার্যকর, হৃদয়স্পর্শী ও ফলপ্রসূ করে তোলে। আদর্শ দ্বায়ী হতে হলে তাকে প্রথমে নিজের চরিত্র ও মনকে পরিশুদ্ধ করতে হয়। তার কথা ও কাজের মধ্যে থাকতে হবে সামঞ্জস্য, আন্তরিকতা ও আল্লাহভীতি। তিনি যেন মানুষের মাঝে দ্বীনের সৌন্দর্য তুলে ধরেন আচরণ ও নৈতিকতার মাধ্যমে। কারণ মানুষ মুখের কথা নয়, বরং আচরণের মাধ্যমে বেশি প্রভাবিত হয়।

দ্বায়ীকে হতে হবে জ্ঞানী, ধৈর্যশীল, বিনয়ী এবং সহানুভূতিশীল। তার মাঝে থাকতে হবে হিকমাহ (বুদ্ধিদীপ্ততা), উত্তম উপদেশ, নরম ভাষা ও আন্তরিকতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।" (সহীহ বুখারী)

দ্বায়ী কখনো কঠোর হয় না, অহংকার করে না, বা কাউকে হেয় করে না। সে মানুষের ভুলের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে প্রজ্ঞার সঙ্গে। তার উদ্দেশ্য থাকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি, কোনো ব্যক্তিগত লাভ নয়। আদর্শ দ্বায়ী জানে দাওয়াত একটি দীর্ঘ পথ, যেখানে ধৈর্য, পরিশ্রম ও ত্যাগ অপরিহার্য। সে জানে, তার কাজ শুধু আহ্বান করা,

ফল আল্লাহর হাতে। তাই সে কখনো হতাশ হয় না, বরং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে দাওয়াত চালিয়ে যায়।

এই অধ্যায়ে আমরা জানব একজন আদর্শ দ্বায়ীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন: হিকমাহ অবলম্বন, উত্তম উপদেশ, বিনয়, উদারতা, পরিশ্রম, আল্লাহর ওপর আস্থা ইত্যাদি।একজন দ্বায়ী এর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা অত্যাবশ্যক।

৪.১ হিকমাহ অবলম্বনকারী হওয়া

একজন আদর্শ দ্বায়ীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো হিকমাহ, অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিদীপ্ততা। হিকমাহ মানে শুধু জ্ঞান নয়, বরং জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার কখন, কোথায়, কাকে, কীভাবে দাওয়াত দিতে হবে, সেটি বোঝা। হিকমাহ হলো এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যা দ্বায়ীকে মানুষের মনের দরজা খুলে দেয়ার উপায় শেখায়। যে দ্বায়ী হিকমাহ অবলম্বন করে, সে জানে সব মানুষ এক রকম নয়, তাদের মানসিকতা, অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতিও ভিন্ন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন হিকমাহর সর্বোত্তম উদাহরণ। তিনি কখনো কঠোরতা প্রদর্শন করেননি, বরং কোমলভাবে মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করেছেন। একবার এক বেদুইন মসজিদে মূত্রত্যাগ করলে সাহাবারা রাগে ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু নবী ﷺ তাকে শান্তভাবে বোঝান। তিনি বলেন,

"তাকে বিরক্ত করো না, বরং তার উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।"(সহীহ বুখারী)

এটাই হিকমাহ পরিস্থিতি বুঝে এমনভাবে আচরণ করা, যাতে দাওয়াতের ফল ইতিবাচক হয়। হিকমাহ দ্বায়ীকে শিখায় কখন কঠোর হতে হবে, কখন নরম হতে হবে, আর কখন নীরব থাকতে হবে।

প্রজ্ঞাহীন দাওয়াত অনেক সময় মানুষকে ইসলামের প্রতি বিমুখ করে দিতে পারে। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

"যাকে হিকমাহ দান করা হয়েছে, তাকে তো মহা কল্যাণ দান করা হয়েছে।"(সূরা আল-বাকারা, ২৬৯)

এই আয়াত প্রমাণ করে, হিকমাহ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান।

দ্বায়ী যদি হিকমাহ থেকে বঞ্চিত হয়, তার দাওয়াতের ভাষা শীতল হয়ে যায়, আর উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে প্রভাব। প্রজ্ঞাবান দ্বায়ী জানে মানুষকে জোর করে নয়, বরং ভালোবাসা ও

যুক্তির মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হয়। নবী ﷺ এর হিকমাহ ছিল এত গভীর যে, তিনি শত্রুকেও বন্ধুত্বে পরিণত করতেন। তিনি কখনো ব্যক্তির ওপর নয়, বরং তার ভুলের ওপর আলোকপাত করতেন। এতে মানুষ তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতো এবং মন খুলে দাওয়াত গ্রহণ করত।।হিকমাহ দ্বায়ীকে রাগ, অহংকার ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত রাখে। একজন হিকমাহসমৃদ্ধ দ্বায়ী কখনো মানুষকে লজ্জিত বা হেয় করে না। বরং তাদের সম্মান রক্ষা করে সত্যের পথে ডাকে।অতএব, হিকমাহ দ্বায়ীকে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে দেয়। হিকমাহ ছাড়া দাওয়াত শুধু কথার ধ্বনি, কিন্তু হিকমাহসহ দাওয়াত হয় হৃদয়ের আহ্বান।

একজন প্রজ্ঞাবান দ্বায়ী জানে, আল্লাহর পথে আহ্বান করা মানে মানুষের হৃদয়ে আলো জ্বালানো। তাই সে চিন্তা করে, দোয়া করে, তারপর কথা বলে যেন প্রতিটি শব্দ আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হয়। হিকমাহর মাধ্যমে দ্বায়ী শুধু দাওয়াত দেয় না, বরং মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্য দেখায় জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে এই গুণই তাকে আদর্শ দ্বায়ী বানায় প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও সহমর্মিতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে।

৪.২ উত্তম উপদেশ দানের অধিকারী হওয়া

দাওয়াতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো উত্তম উপদেশ দানের ক্ষমতা। একজন দ্বায়ীর মুখে যখন উপদেশ আসে, সেটি যেন শুধু তথ্য না হয়ে, হৃদয় স্পর্শকারী অনুপ্রেরণায় পরিণত হয়। উপদেশ তখনই উত্তম হয়, যখন তাতে থাকে আন্তরিকতা, কোমলতা ও বাস্তবতার ছোঁয়া। দ্বায়ীকে বুঝতে হবে, মানুষ ভুল করে, কিন্তু সে কখনো তিরস্কারে সংশোধিত হয় না, বরং ভালোবাসা ও উপদেশে বদলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বোত্তম উপদেশদাতা। তাঁর কথা ছিল সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট এবং গভীর অর্থবহ। একবার তিনি বলেছিলেন,

"দুনিয়ায় এমনভাবে থেকো, যেন তুমি একজন পথিক বা পথচলতি ভ্রমণকারী।"(সহীহ বুখারী)

এই একটিমাত্র উপদেশ মানুষের অন্তর পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট। তিনি মানুষকে ভয় দেখিয়ে নয়, বরং আশা ও ভালোবাসার ভাষায় দাওয়াত দিতেন। উপদেশ দিতে গিয়ে কখনো কারো নাম ধরে দোষারোপ করতেন না, বরং বলতেন,

"কী হয়েছে কিছু লোকের, যারা এমন কাজ করছে..."

এভাবে তিনি ব্যক্তিকে হেয় না করে ভুলটি সংশোধন করতেন।

উত্তম উপদেশের জন্য দ্বায়ীর নিজের চরিত্র হতে হবে আলোকিত। কারণ উপদেশের প্রভাব বক্তার আচরণের ওপর নির্ভর করে।যে ব্যক্তি নিজে আমল করে, তার উপদেশ হৃদয়ে গিয়ে লাগে, আর যে নিজে আমল করে না, তার কথা কানে গিয়ে ফিরে আসে। আল্লাহ বলেন,

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মে আহ্বান করবে অথচ নিজেদের ভুলে যাবে?"(সূরা আল-বাকারা, ৪৪)

এই আয়াত দ্বায়ীকে স্মরণ করিয়ে দেয়, উত্তম উপদেশ মানে শুধু সুন্দর কথা বলা নয়, বরং নিজে সেই কথার প্রতিফলন হওয়া।

দ্বায়ী যেন মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে ভালোবাসা, আশাবাদ ও আখিরাতের চিন্তার মাধ্যমে।উত্তম উপদেশের বৈশিষ্ট্য হলো -

এটি হৃদয়ে শান্তি আনে, অহংকার কমায়, এবং মানুষকে আল্লাহর স্মরণে নিয়ে যায়। দ্বায়ীকে তাই এমনভাবে কথা বলতে হবে, যেন তার প্রতিটি শব্দ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা জাগায়। রাসূল ﷺ বলেছেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমল, তিনি কোমলতাকে ভালোবাসেন এবং কঠোরতাকে অপছন্দ করেন।" (সহীহ মুসলিম)

উত্তম উপদেশ মানে কোমল ও বাস্তবভিত্তিক দাওয়াত। এটি কাউকে হেয় করে না, বরং উন্নতির পথ দেখায়। দ্বায়ীর উচিত তার শ্রোতাদের বয়স, মানসিকতা ও জ্ঞানের স্তর অনুযায়ী ভাষা নির্বাচন করা। একই উপদেশ সবার জন্য একভাবে প্রযোজ্য নয়, এখানেই হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মেলবন্ধন ঘটে। দ্বায়ীর উপদেশে থাকতে হবে ইতিবাচকতা, যেন মানুষ তার কাছে শান্তি অনুভব করে। কঠোর সমালোচনা নয়, বরং আশাবাদী নির্দেশ মানুষকে ঈমানের পথে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। উপদেশ যেন হয় কোমল, আল্লাহভীতিপূর্ণ, এবং শ্রোতার অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে দ্বায়ী উত্তম উপদেশ প্রদান করতে পারে, সে হৃদয় জয় করতে পারে। তার দাওয়াত শুধু কান পর্যন্ত নয়, আত্মার গভীরে পৌঁছে যায়। এমন দ্বায়ীর কথা আল্লাহর সাহায্যে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

৪.৩ টার্গেটকৃত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মানসিকতার প্রতি নজর দেওয়া

একজন আদর্শ দ্বায়ীর জন্য অপরিহার্য গুণ হলো - যার কাছে দাওয়াত পৌঁছানো হচ্ছে, তার মানসিকতা ও অবস্থান বুঝে দাওয়াত প্রদান করা। সব মানুষ এক রকম নয়, তাদের জ্ঞান, চিন্তা, অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতি ও মানসিকতা একে অপরের থেকে ভিন্ন। তাই দাওয়াতের পদ্ধতিও হতে হবে শ্রোতার মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ এক রূঢ় হৃদয়ের মানুষের জন্য যেমন কঠোর যুক্তি প্রয়োজন, এক কোমল হৃদয়ের মানুষের জন্য সেখানে শুধু ভালোবাসার

কথা-ই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াতের ক্ষেত্রে মানুষের মানসিকতা গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। তিনি যখন মক্কার কুরাইশ নেতাদের সঙ্গে কথা বলতেন, তখন যুক্তি ও ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিতেন। আর যখন একজন সাধারণ বেদুইনের সঙ্গে কথা বলতেন, তখন সহজ উদাহরণ ব্যবহার করতেন। উদাহরণস্বরূপ, একবার এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল,

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি ব্যভিচার করতে পারি?"

সাহাবারা রেগে উঠলেন, কিন্তু নবী ﷺ শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন,

"তুমি কি চাও, কেউ তোমার মায়ের সঙ্গে এটি করুক?"

সে বলল, "না।"

নবী ﷺ বললেন, "তাহলে অন্যের প্রতিও একইভাবে চিন্তা করো।"(মুসনাদে আহমাদ)

এটি ছিল মানসিকতা বোঝে দাওয়াত দেওয়ার এক অনন্য উদাহরণ। রাসূল ﷺ কঠোর ভাষা নয়, বরং হৃদয় ছোঁয়া প্রশ্নের মাধ্যমে মানুষকে সংশোধন করতেন। দ্বায়ী যদি মানুষের মনস্তত্ত্ব না বোঝে, তাহলে দাওয়াত অনেক সময় ভুলভাবে পৌঁছায়। একজন অশিক্ষিত মানুষের কাছে উচ্চস্তরের যুক্তি অকার্যকর, আবার একজন জ্ঞানীর কাছে অতিরিক্ত সরলীকরণ বিরক্তির কারণ হতে পারে। তাই দ্বায়ীকে জানতে হবে, "আমি কার সঙ্গে কথা বলছি?" এবং "সে কীভাবে চিন্তা করে?"

আল্লাহ তাআলা কুরআনে নবীদের দাওয়াতের উদাহরণ দিয়ে বলেন,

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ

"আমরা প্রত্যেক রাসূলকে তার সম্প্রদায়ের ভাষায় পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের কাছে স্পষ্টভাবে বুঝাতে পারে।" (সূরা ইবরাহীম, ৪)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, দাওয়াত কেবল ভাষার নয়, বরং মানসিক যোগাযোগের বিষয়। দ্বায়ীকে মানুষের অবস্থান বুঝে ভাষা, উদাহরণ ও আবেগের সামঞ্জস্য রাখতে হয়। একজন দ্বায়ী যদি শিক্ষিত শ্রেণির কাছে দাওয়াত দেন, তাহলে তার ভাষায় থাকতে হবে যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তি। আর সাধারণ মানুষের জন্য থাকতে হবে সরলতা, গল্প ও উদাহরণের ছোঁয়া।

মানুষের অনুভূতি ও আবেগকে উপেক্ষা করলে দাওয়াতের ফল হয় শূন্য। একজন প্রজ্ঞাবান দ্বায়ী সবসময় শ্রোতার দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে। সে বুঝতে চেষ্টা করে, কীভাবে তার সামনে থাকা ব্যক্তি সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত। সে কখনো তাড়াহুড়ো করে না, বরং উপযুক্ত সময় ও ভাষা বেছে নেয়।মানুষের মন জয় করতে হলে আগে তাদের মন বোঝা জরুরি।এই বোঝাপড়াই সফল দাওয়াতের প্রথম ধাপ।

৪.৪ দাওয়াতকে সহজ করে পেশ করা

দাওয়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সহজভাবে ইসলামের বার্তা উপস্থাপন করা। ইসলাম নিজেই একটি সহজ ও প্রাকৃতিক ধর্ম, তাই এর দাওয়াতকেও হতে হবে সহজ, স্পষ্ট ও বোধগম্য। যদি দাওয়াত জটিল ভাষায় বা কঠোরভাবে উপস্থাপন করা হয়, মানুষ দূরে সরে যায়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য ধর্মে কোনো কষ্ট রাখেননি।"(সূরা আল-হাজ্জ, ৭৮)

এই আয়াত প্রমাণ করে, ইসলাম সহজবোধ্য ও মানবপ্রকৃতির উপযোগী ধর্ম।
অতএব, দ্বায়ীকে এমনভাবে দাওয়াত দিতে হবে যাতে মানুষ স্বাভাবিকভাবে সত্যকে বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
"তোমরা মানুষকে সহজ করে দাও, কঠিন করো না। আনন্দ দাও, ঘৃণা সৃষ্টি করো না।"(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসটি দাওয়াতের মূলনীতি ইসলামকে জটিল নয়, বরং আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা।
নবী ﷺ কখনো দাওয়াতকে ভারী বা কঠোর করেননি, তিনি মানুষের বোধগম্য ভাষায় কথা বলতেন। তিনি বুঝতেন, মানুষ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়, তাই তাদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো উচিত নয়। একজন আদর্শ দ্বায়ীর উচিত মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্য ও সহজতা দেখানো।যেমন - নামাজ, রোজা, সৎকাজ, দান এসবকে আনন্দের ও আখিরাতমুখী পুরস্কারের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা। দাওয়াত এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে মানুষ ভয় নয়, বরং আশা অনুভব করে। আল্লাহ বলেন,

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ

"আমার বান্দাদের বল, তারা যেন এমন কথা বলে যা উত্তম, নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।" (সূরা আল-ইসরা, ৫৩)

এই আয়াত আমাদের শেখায়, দাওয়াতের ভাষা কোমল ও ইতিবাচক হতে হবে।

কঠোর বা হুমকিমূলক ভাষা মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়, কিন্তু সহজ ভাষা হৃদয়ে প্রবেশ করে। দাওয়াত সহজ করার মানে হলো – ইসলামের গভীর বিষয়গুলো মানুষে মানুষে বাস্তব উদাহরণে তুলে ধরা। যেমন নবী ﷺ প্রায়ই দাওয়াত দিতেন গল্প, উপমা ও জীবনের বাস্তব দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে। তিনি কখনো কাউকে লজ্জিত করতেন না, বরং এমনভাবে বলতেন যাতে সে নিজে থেকে ভুল বুঝতে পারে। দ্বায়ীকে মনে রাখতে হবে, ইসলামের সৌন্দর্য তার সরলতায়। যে দ্বায়ী জটিল যুক্তি, কঠিন পরিভাষা বা অহংকারপূর্ণ উপস্থাপন করে, তার দাওয়াত কার্যকর হয় না। মানুষ সরল সত্য ভালোবাসে, তাই দাওয়াতের ভাষা ও ধরনও সরল হতে হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন,
"আমি সহজ ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।" (মুসনাদে আহমাদ)

এখান থেকে বোঝা যায়, ইসলামের বার্তা কখনো মানুষের জন্য ভারী নয়।
একজন দ্বায়ী যদি ইসলামকে কঠিনভাবে উপস্থাপন করে, তবে সে আসলে দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীতে কাজ করে। দাওয়াতকে সহজ করে পেশ করা মানে হলো, শ্রোতার বুঝার ক্ষমতা অনুযায়ী বার্তা সাজানো। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা, আর একজন সাধারণ মানুষের জন্য সহজ ভাষা ও বাস্তব উদাহরণ যথেষ্ট।
দ্বায়ীকে সবসময় ভাবতে হবে, তার উদ্দেশ্য বিতর্ক নয়, বরং হৃদয়ের পরিবর্তন। যে দাওয়াত মানুষের হৃদয়ে প্রশান্তি আনে, সেটিই সফল দাওয়াত। একজন দ্বায়ী যত সহজভাবে ইসলাম উপস্থাপন করতে পারে, ততই মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কারণ সরলতা মানুষের হৃদয়ের ভাষা, আর ইসলাম সেই হৃদয়ের ধর্ম।

৪.৫ কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য থাকা

দাওয়াতের সবচেয়ে পবিত্র ও মৌলিক নীতি হলো – আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। একজন প্রকৃত দ্বায়ী কখনো প্রশংসা, খ্যাতি বা মানুষের স্বীকৃতির জন্য দাওয়াত দেয় না। তার দাওয়াতের উদ্দেশ্য শুধু একটাই আল্লাহর রিদা বা সন্তুষ্টি লাভ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

"তুমি বলো, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।"(সূরা আল-আনআ'আম, ১৬২)

এই আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, একজন মুসলমানের প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত।
দাওয়াত কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সামাজিক মর্যাদার বিষয় নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
"কাজের ফল নির্ভর করে নিয়তের উপর। আর যার নিয়ত যেটির জন্য, সে সেটিই পাবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীস দাওয়াতের মূল ভিত্তি।
দ্বায়ী যদি নিঃস্বার্থভাবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, তার দাওয়াত বরকতময় হয়। আর যদি সে দুনিয়াবি স্বার্থে বা প্রশংসার আশায় দাওয়াত দেয়, তবে তার আমল বৃথা হয়ে যায়। দাওয়াত এমন এক ইবাদত, যা শুধু মুখের কথা নয়, এটি আত্মার আমল। যে দ্বায়ী নিজের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ রাখে এবং সব কাজ আল্লাহর জন্য করে, তার দাওয়াতের প্রভাব গভীর হয়। আল্লাহ বলেন,

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ

"তাদেরকে কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল যে তারা যেন শুধু আল্লাহর জন্যই দীনকে খাঁটি রাখে।"(সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, ৫)

এই আয়াত দ্বায়ীকে শেখায় দাওয়াতের মূল শর্ত হলো إخلاص (খাঁটি নিয়ত)। মানুষের প্রশংসা নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই সফলতার মাপকাঠি। যখন দ্বায়ীর উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি হয়, তখন সে কোনো ফলাফলের চিন্তা করে না। সে কেবল তার দায়িত্ব পালন করে এবং সফলতা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়। এই মনোভাবই তাকে ধৈর্যশীল ও অবিচল রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াত দিয়েছেন নিজের কষ্ট, ত্যাগ ও অপমান সহ্য করেও, কারণ তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি। তিনি কখনো প্রতিদান বা প্রশংসা চাননি। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

ۚ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰي رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান কেবল সেই আল্লাহর কাছে, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"(সূরা আশ-শু'আরা, ১০৯)

এই কথাটি ছিল সকল নবীর দাওয়াতের ঘোষণা। তারা মানুষকে বলতেন,

"আমরা তোমাদের কোনো পুরস্কার বা অর্থ চাই না, আমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই।" একজন দ্বায়ী যদি এই নীতি ধারণ করে, তাহলে তার দাওয়াত আন্তরিক হয় এবং মানুষ তা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করে। কারণ মানুষ আন্তরিকতা অনুভব করতে পারে। এবং যে দ্বায়ী নিঃস্বার্থভাবে কথা বলে, তার কথা প্রভাবিত করে। যখন দাওয়াতের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি হয়, তখন দ্বায়ী প্রশান্ত থাকে, ফলাফল যাই হোক না কেন। সে জানে, আল্লাহ তার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন, এমনকি যদি মানুষ তা না বোঝেও। এই إخلاص বা খাঁটি নিয়তই একজন দ্বায়ীর আত্মাকে শক্তিশালী করে তোলে। সে দাওয়াত দেয় ভালোবাসা দিয়ে, পরিশ্রম করে ধৈর্য নিয়ে, এবং সফলতার আশা রাখে শুধু আল্লাহর কাছে। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَي اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰي ۗ وَاِلَي اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে নিজের মুখ আল্লাহর দিকে সমর্পণ করে, সে নিশ্চয়ই দৃঢ় হস্তাকরে ধরেছে।"(সূরা লুকমান, ২২)

অতএব, একজন দ্বায়ীর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এই নীতি থাকা উচিত,
"আমি এটি করছি শুধু আল্লাহর জন্য।"

৪.৬ বিনয়ের সহিত দাওয়াত দেওয়া

বিনয় (নম্রতা) একজন আদর্শ দ্বায়ীর অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। দাওয়াতের ক্ষেত্রে অহংকার, আত্মপ্রশংসা বা গর্ব দ্বায়ীর প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দেয়। কারণ ইসলাম অহংকার নয়, বরং নম্রতা, ধৈর্য ও ভালোবাসার বার্তা দেয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَي الْاَرْضِ هَوْنًا

"আর রহমানের বান্দারা তারা, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।"(সূরা আল-ফুরকান, ৬৩)

এই আয়াতে আল্লাহ সেই মানুষদের প্রশংসা করেছেন যারা বিনয়ী ও শান্ত স্বভাবের।
দাওয়াতের ক্ষেত্রেও এই গুণটি অপরিহার্য। একজন দ্বায়ী যদি বিনয়ের সঙ্গে কথা বলে, তাহলে তার কথা মানুষের হৃদয়ে পৌঁছায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।"(সহীহ মুসলিম)
এটি প্রমাণ করে যে, বিনয় শুধু মানবিক গুণ নয়, বরং আল্লাহপ্রদত্ত মর্যাদার পথ।
দাওয়াত হলো মানুষের হৃদয়ে আলোর সঞ্চার, আর এই আলো অহংকারে নয়, বিনয়ে জ্বলে।
নবী ﷺ ছিলেন দুনিয়ার সবচেয়ে বিনয়ী মানুষ। তিনি দাস, দরিদ্র, শিশু ও নারী সকলের সঙ্গে সমানভাবে কথা বলতেন। তিনি কখনো নিজের জ্ঞান বা মর্যাদা দেখিয়ে কথা বলতেন না, বরং সাধারণভাবে মানুষকে বোঝাতেন। বিনয় মানে নিজেকে ছোট ভাবা নয়, বরং অন্যের মর্যাদাকে স্বীকার করা। একজন দ্বায়ী যদি শ্রোতার অবস্থান, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, তবে তার দাওয়াত সফল হয়। বিনয়ের সঙ্গে দাওয়াত দিলে মানুষ দ্বায়ীকে ভালোবাসে এবং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰي

"তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও এবং তার সঙ্গে কোমলভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে।"(সূরা ত্ব-হা, ৪৪)

এ আয়াত দাওয়াতের একটি অসাধারণ শিক্ষা –
যে ফেরাউনও ছিল সবচেয়ে অহংকারী, তার সাথেও আল্লাহ দ্বায়ীদের কোমলভাবে কথা বলতে বলেছেন। অতএব, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কঠোর বা অহংকারী আচরণ করা তো আরও অযৌক্তিক। দাওয়াতের সময় দ্বায়ীর উচিত অহংকার থেকে দূরে থাকা এবং মানুষকে নিজের সমান মনে করা। কারণ দাওয়াত কোনো ক্ষমতার প্রদর্শন নয়, বরং এটি দয়া ও ভালোবাসার আহ্বান। রাসূল ﷺ বলেন,
তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম,যে বিনয়ী, কোমল ও মানুষের সঙ্গে ভালো আচরণ করে।"(তিরমিযি)
একজন বিনয়ী দ্বায়ী মানুষকে ছোট করে না, বরং তাদের সম্মান দেয়। সে জানে, দাওয়াত সফল হয় তখনই যখন মানুষ নিজেকে নিরাপদ ও সম্মানিত বোধ করে। বিনয় দ্বায়ীর হৃদয়কে পরিশুদ্ধ রাখে এবং তার জ্ঞানকে ফলপ্রসূ করে। অহংকারী দ্বায়ী হয়তো অনেক জানে, কিন্তু মানুষ তার কাছ থেকে শিখতে চায় না। অন্যদিকে, বিনয়ী দ্বায়ী অল্প কথায়ও অনেক হৃদয় জয় করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

“তুমি তোমার ডানা নম্রভাবে নামাও সেই মুমিনদের জন্য যারা তোমার অনুসারী।”(সূরা আশ-শু‘আরা, ২১৫)

এই আয়াতের অর্থ হলো , দ্বায়ী যেন তার অনুসারীদের প্রতি নম্রতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করে।
কারণ, দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিচু করা নয়, বরং তাদের উঁচু মর্যাদায় উন্নীত করা। একজন বিনয়ী দ্বায়ী কখনো বলে না, “*আমি জানি, তুমি জানো না।*”
বরং সে বলে, “*আমরা সবাই শেখার পথে, আমি শুধু তোমাকে একটি সুন্দর বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাই।*”
বিনয়ের সঙ্গে দাওয়াত দিলে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য অনুভব করে।।আর যে দ্বায়ী বিনয়ের পথ বেছে নেয়, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করেন।

৪.৭ বুদ্ধিমত্তার সহিত দাওয়াত দেওয়া

একজন আদর্শ দ্বায়ীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা (হিকমাহ)। দাওয়াত কেবল জ্ঞান নয়, বরং সঠিক সময়, উপযুক্ত ভাষা ও পরিস্থিতি বোঝার এক মহান শিল্প। যিনি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে দাওয়াত দেন, তার কথা যেমন প্রভাব ফেলে, তেমনি মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী ছাপ ফেলে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

اُدْعُ اِلٰي سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۗ

“তুমি তোমার প্রভুর পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।”(সূরা আন-নাহল, ১২৫)

এই আয়াতে আল্লাহ দাওয়াতের মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন, দাওয়াত দিতে হবে হিকমাহ (বুদ্ধিমত্তা), মওয়েযাহ হাসানাহ (উত্তম উপদেশ) এবং জ্ঞানভিত্তিক যুক্তি দিয়ে। বুদ্ধিমত্তা মানে কৌশলপূর্ণভাবে কথা বলা, যাতে সত্য বার্তাটি হৃদয়ে পৌঁছে যায়। নবী ﷺ কখনো কারও ভুল ধরিয়ে দিতে সরাসরি অপমান করতেন না। তিনি এমনভাবে বলতেন, যাতে ভুল ব্যক্তিটি নিজে থেকেই তার ত্রুটি বুঝতে পারে।
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন,

ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ

"যে ব্যক্তি প্রজ্ঞা লাভ করেছে, সে নিশ্চয়ই বিপুল কল্যাণ লাভ করেছে।" (সূরা আল-বাকারা, ২৬৯)

এ আয়াত ইঙ্গিত দেয়, হিকমাহ বা প্রজ্ঞা আল্লাহর এক বিশেষ দান, যা দ্বায়ীদের জন্য অপরিহার্য। কারণ দাওয়াত কেবল সত্য বলা নয়, বরং কীভাবে, কখন এবং কাকে বলা হবে, সেটি জানা। বুদ্ধিমত্তার অভাবে দাওয়াত কখনো উল্টো ফল দিতে পারে। যেমন, কেউ যদি ক্রোধে বা বিদ্রুপের সুরে ইসলামের কথা বলে, মানুষ সত্যের পরিবর্তে আচরণটাই দেখে। তাই দ্বায়ীর উচিত ধৈর্য, চিন্তাভাবনা ও যুক্তির সমন্বয়ে কথা বলা। নবী ﷺ মানুষকে শিক্ষা দিতেন তাদের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে। কোনো নতুন মুসলিমের জন্য তিনি সহজ কথা বলতেন, আর সাহাবিদের মতো শিক্ষিতদের জন্য গভীর বিষয় ব্যাখ্যা করতেন। এটাই ছিল তাঁর দাওয়াতের বুদ্ধিমত্তা। একজন দ্বায়ীর উচিত মানুষের মানসিকতা, শিক্ষা, বয়স ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বুঝে কথা বলা। যে তরুণ সন্দেহে ভুগছে, তার সঙ্গে ভালোবাসা ও যুক্তি দিয়ে কথা বলতে হবে, আর যে অজ্ঞ, তার কাছে সহজ ভাষায় ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতে হবে। রাসূল ﷺ এর জীবন দাওয়াতের বুদ্ধিমত্তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি যখন যুবককে জিনা থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন, তখন ক্রোধ না দেখিয়ে যুক্তি ও অনুভূতির মাধ্যমে বোঝালেন। ফলে যুবক নিজে থেকেই তওবা করেছিল। একজন দ্বায়ী যদি মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারে, তবে সে দাওয়াতে সফল হবে। বুদ্ধিমত্তা মানে কেবল জ্ঞান নয়, বরং ধৈর্য, শ্রবণ ও সময় নির্বাচন। আল্লাহ বলেন,

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰي مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ

"বল, হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের অবস্থায় কাজ করো, আমি আমার অবস্থায় কাজ করছি, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার জন্য পরিণাম উত্তম।" (সূরা আনআম, ১৩৫)

এই আয়াতে রয়েছে প্রজ্ঞা, কঠোরতা নয়, বরং দৃঢ় কিন্তু শান্ত বার্তা প্রদান। দাওয়াতের সময় দ্বায়ীর উচিত রাগ, বিতর্ক ও অহংকার থেকে দূরে থাকা। সে যেন এমনভাবে কথা বলে, যাতে সত্যের বার্তা শ্রোতার মনে প্রতিধ্বনি তোলে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

"প্রজ্ঞা সেই জিনিস যা মুমিনের হারানো সম্পদ, সে যেখানেই তা পায়, গ্রহণ করবে।"(তিরমিযি)

অতএব, একজন দ্বায়ীর উচিত বিভিন্ন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে দাওয়াতে প্রজ্ঞা অর্জন করা। কারণ প্রজ্ঞাই দাওয়াতকে কার্যকর ও স্থায়ী করে তোলে। যে দ্বায়ী প্রজ্ঞাসম্পন্ন,

সে মানুষকে ভালোবাসে, বোঝে ও তাদের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলে। তার দাওয়াত মানুষকে বিমুখ নয়, বরং আকৃষ্ট করে।

৪.৮ কঠোর পরিশ্রম করা

দাওয়াতের কাজ কখনো সহজ নয়। এটি ধৈর্য, আত্মত্যাগ, অধ্যবসায় এবং নিরলস প্রচেষ্টার একটি দীর্ঘ যাত্রা। একজন দ্বায়ী যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য রাখে, তবে তাকে কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে। কারণ, ইসলামের দাওয়াত শুধুমাত্র মুখের কথা নয়। এটি আমল, ত্যাগ ও ধারাবাহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে ফলপ্রসূ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ﻻ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰي

"মানুষের জন্য সে-ই আছে, যা সে চেষ্টা করে।"(সূরা আন-নাজম, ৩৯)

এই আয়াত স্পষ্ট করে দেয়, পরিশ্রমই সফলতার মূল। যে দ্বায়ী নিজের দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান, তার সামান্য প্রচেষ্টাও আল্লাহর দরবারে অমূল্য।

দাওয়াতের পথ কখনো ফুলের বিছানা নয়। এ পথে ক্লান্তি, ত্যাগ, তিরস্কার ও বাধা অবধারিত। কিন্তু একজন পরিশ্রমী দ্বায়ী এই সব কষ্টকে আল্লাহর পথে কুরবানি মনে করে নেয়। সে জানে, তার প্রতিটি চেষ্টা আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিশ্রমী ব্যক্তি। তিনি মক্কার রাস্তায় রোদে, বালিতে, কষ্টের মধ্যে আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন। তিন দিন না খেয়ে থেকেও তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন। একটি হাদীসে এসেছে,

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো সেই কাজ, যা নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা অল্প।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, দাওয়াতের কাজে স্থায়ী প্রচেষ্টা ও ধারাবাহিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একজন পরিশ্রমী দ্বায়ী কাজের পরিমাণে নয়, বরং এর ধারাবাহিকতায় মনোযোগ দেয়। দাওয়াতের ফল তাৎক্ষণিক না এলেও, পরিশ্রম কখনো বিফল হয় না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তিনি কোনো পরিশ্রমকে বৃথা যেতে দেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ط وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

“যে ব্যক্তি আমার পথে চেষ্টা করে, আমি অবশ্যই তাকে আমার পথে পরিচালিত করব।”(সূরা আল-আনকাবুত, ৬৯)

এই আয়াত দ্বায়ীদের জন্য এক বিশাল অনুপ্রেরণা।

যে ব্যক্তি দাওয়াতের কাজে আন্তরিক পরিশ্রম করে, আল্লাহ তার অন্তরকে শক্তিশালী করেন এবং তার জন্য নতুন পথ খুলে দেন। পরিশ্রমী দ্বায়ী অলসতা বা হতাশায় ভোগে না। সে জানে, আল্লাহর কাজে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। তাই সে সময়, মেধা, সম্পদ ও সামর্থ্য সবকিছু আল্লাহর দাওয়াতে ব্যবহার করে। পরিশ্রম মানে শুধু শারীরিক কষ্ট নয়, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক প্রচেষ্টাও এতে অন্তর্ভুক্ত।

একজন দ্বায়ীর উচিত নিজের জ্ঞান বাড়ানো, নতুন কৌশল শেখা, মানুষের মানসিকতা বোঝা এগুলোও কঠোর পরিশ্রমেরই অংশ। যে দ্বায়ী দাওয়াতের কাজকে আল্লাহর জন্য করে, তার প্রতিটি ক্লান্তি ইবাদতে পরিণত হয়।রাসূল ﷺ বলেছেন,

“মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যে অন্যদের উপকারে আসে।” (সহীহ আল-জামি’)

দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের উপকার করতে হলে, নিঃস্বার্থ পরিশ্রম অপরিহার্য। একজন সত্যিকারের দ্বায়ী বিশ্রাম চায় না, সে চায় মানুষের হিদায়াত। যত কষ্টই আসুক, পরিশ্রমী দ্বায়ী কখনো পিছিয়ে যায় না। সে বিশ্বাস করে, আল্লাহর পথে ঘাম ঝরানোই প্রকৃত সম্মান। যেদিন মানুষ তার শ্রম ভুলে যায়, সেদিনও আল্লাহ তার কাজের পুরস্কার সংরক্ষণ করেন।

৪.৯ উদার মন-মানসিকতা প্রকাশ করা

দাওয়াতের ক্ষেত্র এমন একটি ময়দান, যেখানে মানুষের বিভিন্ন রকম চিন্তা, মানসিকতা ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। একজন আদর্শ দ্বায়ীর উচিত এই বৈচিত্র্যকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা এবং সকলের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করা। উদারতা হলো অন্তরের প্রশস্ততা, যেখানে সংকীর্ণতা, অহংকার, ঈর্ষা বা আত্মকেন্দ্রিকতা থাকে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪

“তোমরা আল্লাহর দয়া অনুসারে কোমল হয়েছো। যদি তুমি কঠোর ও রূঢ় হৃদয়ের হতে, তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে যেত।”(সূরা আলে ইমরান, ১৫৯)

এই আয়াত আমাদের শেখায়, মানুষকে আকৃষ্ট করার মূল চাবিকাঠি হলো কোমলতা ও উদারতা।

যে দ্বায়ী মানুষকে ভালোবাসে, তাদের সম্মান করে এবং আন্তরিকভাবে তাদের কল্যাণ চায়, আল্লাহ তার দাওয়াতকে ফলপ্রসূ করেন। উদার মনোভাব দ্বায়ীকে রাগ, গর্ব ও হীনমন্যতার ফাঁদ থেকে মুক্ত রাখে। সে মানুষের ত্রুটি ধরার চেয়ে তাদের হিদায়াতের সম্ভাবনা খোঁজে। উদারতার অর্থ হলো , অন্যের মতামত মন দিয়ে শোনা,তাদের অবস্থান বোঝা, তারপর সহানুভূতির সঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন উদারতার এক অনন্য উদাহরণ। তিনি তায়েফের মানুষদের কঠিন অপমানের পরও বলেছিলেন,

"হে আল্লাহ! এরা জানে না, তাই তাদের ক্ষমা করে দাও।" (সহীহ বুখারী)

এই হাদীস আমাদের শেখায়, উদার হৃদয় প্রতিশোধ নয়, বরং ক্ষমা ও কল্যাণ কামনা করে। দাওয়াতের প্রকৃত চেতনা এখানেই নিহিত। উদার দ্বায়ী কখনো নিজেকে বড় মনে করে না, বরং সে মানুষকে সমানভাবে সম্মান করে। সে জানে, তার দায়িত্ব শুধু দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া, হিদায়াত দেওয়া আল্লাহর কাজ। উদারতা দ্বায়ীকে ধৈর্যশীল করে তোলে। মানুষ যখন বিরূপ আচরণ করে, তখন সে নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে,"আমার দায়িত্ব শুধু সত্য বলা, ফলাফল আল্লাহর হাতে।"

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ

"সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান নয়। তুমি উত্তম আচরণের মাধ্যমে মন্দকে প্রতিহত করো,তাহলে যার সঙ্গে তোমার শত্রুতা ছিল, সে যেন তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যাবে।"(সূরা ফুসসিলাত, ৩৪)

এই আয়াত দাওয়াতের উদারতার চূড়ান্ত দিক নির্দেশ করে।

যে দ্বায়ী উদার হৃদয়ে কথা বলে, তার প্রতিপক্ষও ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসে। উদারতা দ্বায়ীকে অন্য দ্বায়ীদের প্রতিও সৌহার্দ্যপূর্ণ রাখে। সে তাদের ত্রুটি প্রচার না করে তাদের সাফল্যে খুশি হয়, কারণ তার লক্ষ্য এক আল্লাহর সন্তুষ্টি। এমন দ্বায়ী কখনো বিভেদ ছড়ায় না, বরং ঐক্য সৃষ্টি করে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।" (সহীহ মুসলিম)

দাওয়াতের মূল শক্তি এই দয়ার মনোভাব। উদার দ্বায়ী মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্য দেখাতে পারে, কারণ তার আচরণই মানুষকে আকৃষ্ট করে। একজন সংকীর্ণ মনের দ্বায়ী হয়তো জ্ঞানী, কিন্তু তার দাওয়াত ফলপ্রসূ হয় না, অন্যদিকে উদার দ্বায়ী তার আন্তরিকতা ও সহানুভূতিতে বহু হৃদয় জয় করে নেয়। উদারতা মানে নিজের অহংকে ত্যাগ করে আল্লাহর পথে বিনম্রভাবে

চলা। এমন দ্বায়ীর মুখ থেকে দাওয়াতের বাণী বের হয় হৃদয়ের গভীরতা থেকে, যা মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে যায়।

একজন আদর্শ দ্বায়ীর অন্যতম গুণ হলো বিবেচনাপূর্ণভাবে কথা বলা। দাওয়াত শুধু জ্ঞানের প্রচার নয়, এটি মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলার শিল্প। অতএব, দ্বায়ীর জিহ্বা যেন নিয়ন্ত্রিত হয় চিন্তা, প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۗ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۗ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

“তুমি আমার বান্দাদের বলো, তারা যেন এমন কথা বলে, যা সর্বোত্তম, নিশ্চয়ই শয়তান তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে।”(সূরা বনি ইসরাইল , ৫৩)

এই আয়াত প্রমাণ করে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে বাছাই করা শব্দ কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

একটি ভুল বা কঠিন বাক্য মানুষের অন্তরকে বন্ধ করে দিতে পারে, আর একটি কোমল ও চিন্তাশীল বাক্য তার হৃদয়ে আলো জ্বালাতে পারে। দ্বায়ীর দায়িত্ব হলো এমনভাবে কথা বলা, যাতে বার্তা স্পষ্ট হয় কিন্তু কষ্ট না দেয়। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যুক্ত, আবেগে সংযমী এবং উদ্দেশ্যে পরিশুদ্ধ কথা-ই দাওয়াতের মূল হাতিয়ার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীস দ্বায়ীদের জন্য চিরন্তন শিক্ষা। প্রতিটি কথা বলার আগে ভাবতে হবে, এটি কল্যাণ বয়ে আনবে, নাকি ক্ষতি করবে।

চিন্তাহীন কথা দাওয়াতের পরিবেশ নষ্ট করে ফেলে। অন্যদিকে চিন্তাশীল কথা মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্য বুঝতে সাহায্য করে। দ্বায়ীর উচিত অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক, কটূভাষা ও আত্মপ্রচার থেকে বিরত থাকা। দ্বায়ী যেন তর্কে নয়, বরং ব্যাখ্যায় মন দেয়, সে যেন জয়ের জন্য নয়, বরং হিদায়াতের জন্য কথা বলে। কৃত্রিমতা বা অভিনয় দাওয়াতের আত্মাকে নষ্ট করে। যে দ্বায়ী নিজের কথায় আন্তরিক নয়, তার বার্তা মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলে না।

একজন সত্যিকারের দ্বায়ীর কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকে। তার মুখে সরলতা, আচরণে স্বচ্ছতা, এবং মনে থাকে বিনয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কৃত্রিমভাবে কথা বলতেন না। তিনি সরল, স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলতেন, যাতে প্রতিটি শ্রোতা তার বক্তব্য বুঝতে পারে। এক হাদীসে এসেছে,

“রাসূলুল্লাহ ﷺ কথা বলতেন স্পষ্টভাবে, যাতে যারাই পাশে বসত, তারা তা বুঝে নিতে পারত।” (সহীহ আবূ দাউদ)

এই হাদীস প্রমাণ করে, দাওয়াতের ভাষা জটিল নয়, বরং তা হওয়া উচিত সহজ, প্রভাবশালী ও সত্যভিত্তিক।
একজন চিন্তাশীল দ্বায়ী কখনো আবেগে ভেসে যায় না। সে পরিস্থিতি, সময় ও শ্রোতার মানসিকতা বুঝে কথা বলে। তার প্রতিটি বাক্য যেন হয় হিকমাহ ও দয়া মিশ্রিত। যে দ্বায়ী কৃত্রিমতা ত্যাগ করে আন্তরিকভাবে কথা বলে, তার দাওয়াত মানুষের অন্তরে গভীর ছাপ ফেলে। অন্যদিকে যিনি আত্মপ্রদর্শনের জন্য বলেন, তার কথা বাহ্যিকভাবে আকর্ষণীয় হলেও ফলহীন হয়। দ্বায়ীর উচিত নিজের কথার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকা। একটি বাক্য মানুষের হিদায়াতের কারণ হতে পারে, আবার একটি অবিবেচনাপূর্ণ বাক্য তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে।

৪.১১ কারো বিরুদ্ধে বা কাউকে ছোট করে কথা না বলা

একজন আদর্শ দ্বায়ীর মুখ কখনো কাউকে হেয় করার জন্য খোলে না। দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিচু দেখানো নয়, বরং তাদের আল্লাহর দিকে উত্তোলন করা। তাই যে দ্বায়ী অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায় বা কারো প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে, সে নিজের দাওয়াতের প্রভাব নিজেই নষ্ট করে ফেলে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓي اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ

“হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পর উপহাস করো না,সম্ভবত তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম।” (সূরা আল-হুজুরাত, ১১)

এই আয়াত দ্বায়ীদের জন্য গভীর শিক্ষা বহন করে। কোনো মানুষকে ছোট ভাবা বা তার ত্রুটি তুলে ধরা ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণিত কাজ।
যে ব্যক্তি দাওয়াত দেয়, তাকে সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। মানুষের ভুল তুলে ধরা নয়, বরং তাদের হিদায়াতের পথ দেখানোই দাওয়াতের লক্ষ্য। দ্বায়ীর মুখে কখনো কটূ বাক্য, ব্যঙ্গ বা দোষারোপ থাকা উচিত নয়। যে দ্বায়ী অন্যের মানহানি করে, সে নিজের দাওয়াতের মর্যাদা নষ্ট করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
“এক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সম্মান, জীবন ও সম্পদ হারাম।” (সহীহ মুসলিম)
অর্থাৎ, দ্বায়ীর দায়িত্ব শুধু কথা বলা নয়, তার মুখ যেন অন্যের সম্মান রক্ষা করে এবং সমাজে শান্তির বার্তা ছড়ায়। মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে উদারতা ও নরমতা দাওয়াতের অপরিহার্য শর্ত। দ্বায়ীর উচিত নিজের জিহ্বাকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রাখা। সে যেন কাউকে ছোট

না করে, বরং তাদের ভালো গুণগুলো খুঁজে উৎসাহ দেয়। এই মনোভাব মানুষকে দাওয়াতের দিকে আকৃষ্ট করে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন কাউকে অপমান না করে।" (সহীহ বুখারী)

এই হাদীস দ্বায়ীদের শিষ্টাচারের মূল ভিত্তি।

একজন দ্বায়ীর মুখ থেকে কেবল মঙ্গল, উৎসাহ ও করুণা ঝরে পড়া উচিত। অন্য দ্বায়ীদের সমালোচনা করা বা তাদের ভুল প্রচার করা দাওয়াতের ঐক্য নষ্ট করে এবং মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। একজন প্রকৃত দ্বায়ী নিজের ভাইদের প্রশংসা করে, তাদের ত্রুটি নয়, বরং তাদের প্রচেষ্টার ইতিবাচক দিক তুলে ধরে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

"অবশ্যই তোমার প্রভু সবচেয়ে ভালো জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত এবং কে সঠিক পথে রয়েছে।"(সূরা আল-আনআম, ১১৭)

অতএব, দ্বায়ীর কাজ মানুষকে বিচার করা নয়, বরং তাদের জন্য দোয়া করা, ভালোবাসা দেখানো এবং পথ দেখানো। একজন দ্বায়ীর মুখ যেন কখনো কারো জন্য কষ্টের কারণ না হয়। বরং তার কথায় যেন শান্তি, সাহস ও হিদায়াতের সুবাস ছড়ায়। মানুষের ত্রুটি নিয়ে আলোচনা না করে, সে চেষ্টা করবে তাদের অন্তরের অন্ধকার দূর করার। দাওয়াতের প্রকৃত সৌন্দর্য তখনই ফুটে ওঠে, যখন দ্বায়ী নিজের অহংকার ত্যাগ করে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলে, আর অন্যের ত্রুটি নয়, বরং তাদের সম্ভাবনা দেখতে শেখে।

৪.১২ পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে দাওয়াত দেওয়া

একজন আদর্শ দ্বায়ী কখনো অন্ধভাবে কথা বলেন না। দাওয়াতের জন্য প্রজ্ঞা ও সচেতনতা যেমন জরুরি, তেমনি সময়, স্থান, পরিবেশ ও শ্রোতার মানসিকতাও বোঝা অপরিহার্য। কারণ, একই কথা ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ফল দেয়। কখনো কোমলভাবে, কখনো দৃঢ়ভাবে, আবার কখনো নীরব থেকেও দাওয়াত দেওয়া যায়। এটি নির্ভর করে সময় ও পরিবেশের উপর। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন দাওয়াতের ক্ষেত্রে অসাধারণ কৌশলী। তিনি প্রত্যেক মানুষকে তাদের অবস্থা, বয়স ও মানসিকতা অনুযায়ী সম্বোধন করতেন। একজন বেদুইনকে যেমন সহজভাবে

বুঝাতেন, একজন জ্ঞানীকে তেমনি যুক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে আলোচনায় আনতেন। একটি হাদীসে এসেছে,

"মানুষের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলো, যা তারা বুঝতে পারে। তুমি কি চাও তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করুক?" (সহীহ বুখারী)

এই হাদীস স্পষ্ট করে দেয়, অতি কঠিন, জটিল বা অনুপযুক্ত ভাষা মানুষকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে।

দ্বায়ীর উচিত পরিস্থিতি অনুযায়ী সবচেয়ে উপযুক্ত উপায় বেছে নেওয়া। পরিবেশ বোঝা মানে হলো মানুষের বাস্তবতা ও সংস্কৃতি অনুধাবন করা। যেমন, শহরের মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে যুক্তি, যুক্তিনিষ্ঠ উদাহরণ ও আধুনিক প্রেক্ষাপটে, অন্যদিকে গ্রামীণ মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে সহজ, হৃদয়গ্রাহী ভাষায়। একজন দ্বায়ীর উচিত নিজের এলাকার সামাজিক রীতি, মানুষের মানসিক প্রবণতা এবং সময়ের চাহিদা বোঝা। যে পরিবেশে অল্প কথায় বড় প্রভাব ফেলা যায়, সেখানে দীর্ঘ বক্তৃতার প্রয়োজন নেই। আবার কোনো স্থানে ধৈর্য ও সময়ের বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তাআলা মুসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে ফেরাউনের কাছে পাঠানোর সময় বলেছিলেন,

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰي

"তোমরা তার সঙ্গে কোমলভাবে কথা বলো, সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে।"(সূরা ত্বোয়া-হা, ৪৪)

এই আয়াত দেখায়, এমনকি ফেরাউনের মতো কঠোর মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির সঙ্গেও নরম ও পরিস্থিতি-উপযোগী ভাষা ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটাই দাওয়াতের পরিপক্কতা।

একজন দ্বায়ীকে জানতে হবে কখন কথা বলতে হবে, কখন নীরব থাকতে হবে। কখন তর্ক এড়িয়ে হাসিমুখে বিদায় নিতে হবে, আর কখন সত্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী দাওয়াত দেওয়ার মানে হলো আল্লাহর পথে কৌশলী হওয়া, কিন্তু কখনো আপোষ না করা। কৌশল বদলানো যায়, সত্য নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় দাওয়াত দিতেন গোপনে ও নরমভাবে, কিন্তু মদিনায় গিয়ে রাষ্ট্রীয় শক্তি পাওয়ার পর তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছেন এবং রক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছেন। এটাই পরিস্থিতি বোঝার বাস্তব দৃষ্টান্ত। যে দ্বায়ী সময়ের প্রেক্ষাপট বুঝে কাজ করে, সে দাওয়াতকে আরও কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। মানুষ তার কথায় আন্তরিকতা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণ দেখতে পায়।

৪.১৩ তাড়াহুড়ো পরিহার করা

দাওয়াতি কাজে তাড়াহুড়ো করা একটি বড় ভুল। দাওয়াত হলো মানুষের অন্তরে পরিবর্তন আনার দীর্ঘ ও ধৈর্যের পথ। এখানে ফলাফল তাৎক্ষণিক আসে না। বরং সময়, ধৈর্য ও আল্লাহর সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ

"তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন দৃঢ় সংকল্পবান রাসূলগণ ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, এবং তাদের জন্য তাড়াহুড়ো করো না।" (সূরা আহকাফ, ৩৫)

এই আয়াতে আল্লাহ দ্বায়ীদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, দাওয়াতের সাফল্য নির্ভর করে ধৈর্য ও অবিচলতার ওপর, তাড়াহুড়োর ওপর নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ২৩ বছর ধরে দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু প্রথম কয়েক বছর খুব অল্প মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তিনি কখনো হতাশ হননি, কখনো ফলাফলের জন্য তাড়াহুড়োও করেননি। বরং ধীরে ধীরে, পরিকল্পিতভাবে এবং আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আস্থা রেখে কাজ করেছেন। তাড়াহুড়ো করলে মানুষ বিরক্ত হয়, কখনো আবার বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখায়। যেমন, একবার কেউ সাথে সাথে ইসলামের আহ্বান গ্রহণ না করলে, একজন দ্বায়ীর উচিত তাকে সময় দেওয়া, তার অবস্থান বোঝা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"ধৈর্য হলো আল্লাহর রহমত, আর তাড়াহুড়া হলো শয়তানের কাজ।"(আবু ইয়ালা, মুসনাদ)

এই হাদীস আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ।দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া মানে ফল নষ্ট করে ফেলা। যেমন একটি বীজকে ফল ধরার আগে টেনে বের করলে তা নষ্ট হয়, তেমনি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তনও ধীরে ধীরে ঘটে। দাওয়াতের কাজ কখনো সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না, বরং আন্তরিকতা ও ধৈর্যের ওপর নির্ভর করে। অনেক সময় এক ফোঁটা সত্যিকার দাওয়াতের প্রভাব বছর পরে কারো জীবনে বিপুল পরিবর্তন আনে।

যে দ্বায়ী ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, তার প্রচেষ্টা কখনো বৃথা যায় না। তাড়াহুড়া না করার মানে কাজ ফেলে রাখা নয়, বরং প্রজ্ঞার সঙ্গে সঠিক সময়ের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। দাওয়াতের কাজ যেমন চিন্তাশীল হতে হবে, তেমনি সময়ের বাস্তবতা অনুযায়ী ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে।

একজন দ্বায়ীর বুঝে নেওয়া উচিত, মানুষের হৃদয় রাতারাতি বদলায় না। দাওয়াতের বীজ বপন করার পর সময় দিতে হয়, যেন আল্লাহর ইচ্ছায় তা অঙ্কুরিত হয়ে ফল দেয়। সুতরাং,

তাড়াহুড়া দাওয়াতের সাফল্যের পথে বাধা। ধৈর্য, দৃঢ়তা ও পরিকল্পিত প্রচেষ্টা দাওয়াতের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

৪.১৪ অন্য দ্বায়ীদের দোষ প্রচার না করে ইতিবাচক প্রশংসা করা

একজন আদর্শ দ্বায়ীর হৃদয় সর্বদা ভালোবাসা, সহানুভূতি ও ঐক্যে ভরপুর থাকে। তিনি জানেন, দাওয়াতের কাজ একক ব্যক্তির নয়, বরং এটি একটি সম্মিলিত দায়িত্ব, যেখানে প্রত্যেক দ্বায়ীর ভূমিকা মূল্যবান। অতএব, অন্য দ্বায়ীদের সমালোচনা করা বা তাদের দোষ প্রচার করা দাওয়াতের ঐক্যকে ভেঙে দেয়। এমন মনোভাব দাওয়াতের শক্তি দুর্বল করে এবং শয়তানকে সুযোগ দেয় বিভাজন সৃষ্টির। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ

"তোমরা একে অপরের দোষ অন্বেষণ করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। (সূরা আল-হুজুরাত, ১২)

এই আয়াত শুধু সাধারণ সম্পর্ক নয়, দাওয়াতের ক্ষেত্রেও গভীর তাৎপর্য বহন করে। দ্বায়ীদের মধ্যে পরস্পর শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্য না থাকলে, মানুষ ইসলামের ঐক্যবদ্ধ সৌন্দর্য দেখতে পায় না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার ওপর জুলুম করে না, তাকে অপমান করে না, আর তাকে তুচ্ছও করে না।" (সহীহ মুসলিম)

এই হাদীস দ্বায়ীদের জন্য একটি আদর্শ দিকনির্দেশনা।

অন্য দ্বায়ীর ভুল খুঁজে বেড়ানো নয়, বরং তার ভালো দিক থেকে শিক্ষা নেওয়াই উচিত। যদি কেউ ভুল পথে চলে, তবে গোপনে পরামর্শ দেওয়া উচিত, প্রকাশ্যে নিন্দা করা নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কাউকে প্রকাশ্যে অপমান করতেন না। তিনি বলতেন, "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমন কাজ করছে..."অর্থাৎ, ব্যক্তির নাম না নিয়ে তিনি ভুল সংশোধন করতেন। এটি ছিল তাঁর দাওয়াতের শিষ্টাচার।

অন্য দ্বায়ীদের প্রশংসা করা মানে তাদের প্রচেষ্টাকে সম্মান করা। যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছেন, তিনি আমাদের ভাই, আমাদের সহযাত্রী। তাঁর সাফল্য আমাদেরও সাফল্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَي الْبِرِّ وَالتَّقْوٰي ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۠

“তোমরা একে অপরকে সৎকাজ ও তাকওয়ায় সহযোগিতা করো,অপরাধ ও সীমালঙ্ঘনে নয়।” (সূরা আল-মায়িদাহ, ২)

এই আয়াত দ্বায়ীদের মধ্যে সহযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে নির্দেশ দেয়।
ইতিবাচক মনোভাব মানুষকে দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করে, আর নেতিবাচক সমালোচনা তাদের বিমুখ করে তোলে। একজন দ্বায়ীর উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা, মানুষের প্রশংসা বা প্রতিযোগিতার জন্য নয়। যিনি অন্যের ভালো দেখে আনন্দিত হন, আল্লাহ তাঁর অন্তরে শান্তি দান করেন। দ্বায়ীদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা দাওয়াতের শক্তি বহুগুণ বাড়ায়। যেখানে ভালোবাসা ও সম্মান থাকে, সেখানে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। তাই একজন সচেতন দ্বায়ী কখনো অন্য দ্বায়ীর দোষ প্রচার করেন না। বরং তাঁর ভালো দিক তুলে ধরেন, যেন সমাজে দাওয়াতের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়।

৪.১৫ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা রাখা

একজন আদর্শ দ্বায়ীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো – সব অবস্থায় আল্লাহ তাআলার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখা (তাওয়াক্কুল)। দাওয়াতের কাজ মূলত আল্লাহর আদেশ পালন, অতএব এর ফলাফলও একমাত্র আল্লাহর হাতে। দ্বায়ীর কাজ হলো প্রচেষ্টা করা, আর সফলতা দান করেন একমাত্র আল্লাহ। তাই দাওয়াতের পথে বাধা-বিপত্তি, অসুবিধা বা নিরুৎসাহের সময়েও একজন দ্বায়ীর অন্তরে থাকা উচিত পূর্ণ আস্থা। আল্লাহ আমার সঙ্গেই আছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَي اللهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

“যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।” (সূরা আত-তালাক, ৩)

এই আয়াত দ্বায়ীদের জন্য এক অনন্য শক্তির উৎস।
কারণ দাওয়াত এমন এক কাজ, যেখানে মানুষ অনেক সময় প্রত্যাখ্যান, কষ্ট ও নির্যাতনের মুখোমুখি হয়। এমন অবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভর করাই প্রকৃত সাহস।
রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনে সর্বদা তাওয়াক্কুলের বাস্তব দৃষ্টান্ত রেখেছেন। তায়েফে রক্তাক্ত অবস্থায়ও তিনি আল্লাহর দিকে ফিরে বলেছিলেন,
“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই অভিযোগ করছি আমার দুর্বলতার, মানুষের কাছে নয়।”(ইবন হিশাম, সীরাতুন্নবী)

এই দোয়া প্রমাণ করে,যে দ্বায়ী আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, সে ব্যর্থতা নয়, বরং দয়া ও সহায়তা লাভ করে। দাওয়াতের পথে যত প্রতিকূলতাই আসুক না কেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারালে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু যে দ্বায়ী বলে , "আমার রাব আমার সাথে আছেন," তার সামনে হাজার বিপদও তুচ্ছ হয়ে যায়।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ

"যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন,তবে কেউ তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না।"(সূরা আলে ইমরান, ১৬০)

এই আয়াত দ্বায়ীদের মনে স্থিরতা আনে।
কারণ দাওয়াতের সাফল্য সংখ্যা, পদ বা সম্পদের ওপর নয়, বরং আল্লাহর সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। একজন দ্বায়ী যখন পুরোপুরি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে কাজ করে, তখন সে মানুষকে খুশি করার জন্য নয়, বরং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কথা বলে। এটাই প্রকৃত দাওয়াতের মর্ম। তাওয়াক্কুল মানে কাজ না করে অপেক্ষা করা নয়, বরং সাধ্যমতো চেষ্টা করা এবং ফলাফলের দায়িত্ব আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়া।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
"তুমি তোমার উট বেঁধে রাখো, তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করো।"(তিরমিজি)
অর্থাৎ, প্রচেষ্টা ও আল্লাহর প্রতি আস্থা, দুটোই একজন দ্বায়ীর জীবনে সমানভাবে থাকা উচিত। যে দ্বায়ী আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তার মন শান্ত থাকে, হৃদয় দৃঢ় হয়, এবং বিপদের সময়েও তার মুখে কৃতজ্ঞতার কথা শোনা যায়। দাওয়াতের পথে কখনো মানুষ পাশে থাকবে, কখনো একা থাকতে হবে,কিন্তু একজন মুমিন দ্বায়ী জানে, আল্লাহ কখনো তাঁর দাসকে একা ছেড়ে দেন না।
মুসা (আ.) যখন ফেরাউনের বিশাল বাহিনীর সামনে পড়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গীরা ভয়ে বলেছিল, "আমরা তো ধরা পড়ব।"
মুসা (আ.) শান্তভাবে বলেছিলেন,

قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ

"কখনো না, আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন, তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।"(সূরা আশ-শু'আরা, ৬২)

এটাই একজন দ্বায়ীর হৃদয়ের বিশ্বাস হওয়া উচিত, যত কঠিনই পরিস্থিতি হোক, আল্লাহর সাহায্য নিশ্চিতভাবে আসবে। তাওয়াক্কুল দ্বায়ীকে আত্মবিশ্বাসী করে, অহংকার নয়, বরং বিনয়ী করে তোলে। কারণ সে জানে, সাফল্য তার নিজের প্রচেষ্টায় নয়, বরং আল্লাহর অনুগ্রহে। দাওয়াতের ফলাফল যদি তৎক্ষণাৎ না-ও দেখা যায়, তবু একজন দ্বায়ী ধৈর্য ধরে কাজ চালিয়ে যায়, কারণ সে বিশ্বাস করে , আল্লাহ তাঁর প্রচেষ্টা বৃথা যেতে দেবেন না।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۚ

“নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।” (সূরা আল-কাহফ, ৩০)

এই আয়াত দ্বায়ীকে স্থিরতা ও আশা দেয়। তাওয়াক্কুল শুধু দাওয়াতের শক্তি নয়, এটা দাওয়াতের আত্মা।

অধ্যায় ৫: দ্বায়ীর করণীয়

একজন দ্বায়ী কেবল কথা বলার মানুষ নয়, তিনি আল্লাহর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবন, আচরণ, ও কর্মই দাওয়াতের বাস্তব রূপ। দাওয়াত কেবল মুখের কথা নয় ,এটা হৃদয়ের আমল, নফসের প্রশিক্ষণ ও সমাজে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা। একজন প্রকৃত দ্বায়ীর কাজ হলো মানুষের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা, মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা, এবং নিজে তার আদর্শে অবিচল থাকা।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।”(সহীহ বুখারী ৫০২৭)

অতএব, একজন দ্বায়ীর প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে নিজে শিখে অন্যকে শেখানো। তিনি নিজের আচার-আচরণ, নম্রতা, এবং দায়িত্ববোধের মাধ্যমে ইসলামের আহ্বান বাস্তবে রূপ দেন। দাওয়াতের কাজ শুধুমাত্র আলেম, ইমাম বা নেতা, এদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রত্যেক মুসলমান তার সামর্থ্য অনুযায়ী দাওয়াতের দায়িত্বে নিযুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

“তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, তারাই সফলকাম।” (সূরা আলে ইমরান,১০৪)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, দাওয়াত কোনো ঐচ্ছিক কাজ নয় ,বরং এটি একটি আবশ্যিক দায়িত্ব (ফরজে কিফায়াহ)। সমাজে যদি কেউ এ দায়িত্ব পালন না করে, তবে সবাই গুনাহগার হবে।

একজন দ্বায়ীর করণীয় হচ্ছে ,

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করা, মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্য দেখানো, নরম ভাষায় সত্য কথা বলা, অন্যের ভুলে অপমান না করে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে বোঝানো, এবং নিজের আমল ও আচরণ দিয়ে ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরা। দাওয়াতের কাজ কখনো সহজ নয়। তাতে বাধা, কষ্ট, এবং মানুষের বিরোধিতাও আসবে। কিন্তু একজন দ্বায়ীর উচিত ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবাগণ দাওয়াতের পথে কত কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু কখনো পিছিয়ে যাননি, এটাই আমাদের আদর্শ।

সুতরাং, একজন দ্বায়ীর করণীয় হলো ,

নিজেকে সৎ ও পরিশুদ্ধ রাখা, মানুষের উপকারে সচেষ্ট থাকা, দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজে আলোর সঞ্চার করা, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে জীবন পরিচালনা করা।

৫.১ পরিবার থেকে দাওয়াতি কাজ শুরু করা

দাওয়াতের কাজের সূচনা সর্বপ্রথম নিজের পরিবার থেকেই করা উচিত। পরিবার একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও প্রভাবশালী পরিমণ্ডল। পরিবারে ইসলামের চেতনা জাগ্রত হলে সমাজে তার প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। তাই একজন দ্বায়ীর জন্য দাওয়াতের প্রথম ক্ষেত্র হওয়া উচিত তার নিজের ঘর। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।" (সূরা আত-তাহরীম, ৬)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, একজন মুসলমানের প্রথম দায়িত্ব হলো নিজে ও তার পরিবারকে ঈমান ও সৎকর্মের পথে পরিচালিত করা। নবী নূহ (আঃ) দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন তার পরিবারের সদস্যদের দিয়ে। একইভাবে মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-ও দাওয়াতের সূচনা করেন তাঁর নিকট আত্মীয়স্বজনদের আহ্বান জানিয়ে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۙ

"আর তোমার নিকট আত্মীয়স্বজনদেরকে সতর্ক কর।" (সূরা আশ-শু'আরা, ২১৪)

পরিবারে দাওয়াত শুরু করার অন্যতম কারণ হলো, এটি আন্তরিক ও স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও আস্থা থাকায় দাওয়াতের বাণী সহজে গ্রহণযোগ্য হয়। একজন দ্বায়ী যখন নিজের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা পরিবারে প্রতিফলিত হয়, তখন তার দাওয়াত শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ

"তুমি নিজেকে ও তোমার পরিবারকে নামাজের নির্দেশ দাও এবং তাতে ধৈর্য ধারণ কর।" (সূরা ত্ব-হা, ১৩২)

এই আয়াতের নির্দেশে বোঝা যায় যে, পরিবারে নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত ও দ্বীনি আলোচনা চালু রাখা দাওয়াতের অন্যতম রূপ। একজন দ্বায়ীর উচিত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আল্লাহভীতি, সততা, পরিশুদ্ধতা ও নৈতিকতার পরিবেশ তৈরি করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"তোমরা প্রত্যেকে একজন রাখাল, এবং প্রত্যেকে তার অধীনদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

অতএব, একজন দ্বায়ীর প্রথম দায়িত্ব তার পরিবারকে ইসলামী পথে পরিচালিত করা। পরিবারে দাওয়াত প্রতিষ্ঠা হলে সমাজে দাওয়াতের কাজ আরও কার্যকর হয়। পরিবারে আল্লাহভীতি ও দ্বীনি চেতনা জাগ্রত হওয়া মানে সমাজে আলোর সঞ্চার হওয়া। তাই একজন আদর্শ দ্বায়ীর উচিত নিজের ঘরকেই প্রথম দ্বীনি কেন্দ্র বানানো, যেখান থেকে দাওয়াতের আলো ছড়িয়ে পড়বে গোটা সমাজে।

৫.২ আমলের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া

দাওয়াতের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো , নিজের আমলের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া। একজন দ্বায়ীর কথা তখনই প্রভাব ফেলে, যখন তাঁর জীবন তাঁর কথার সাক্ষ্য দেয়। মুখে এক কথা আর কাজে অন্য কিছু হলে দাওয়াতের প্রভাব হারিয়ে যায়। তাই একজন আদর্শ দ্বায়ীর প্রথম কাজ হলো, নিজের আমলকে দাওয়াতের মূল ভিত্তি বানানো। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَتَاۡمُرُوۡنَ النَّاسَ بِالۡبِرِّ وَتَنۡسَوۡنَ اَنۡفُسَكُمۡ وَاَنۡتُمۡ تَتۡلُوۡنَ الۡكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ

"তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ নিজেদের ভুলে যাও, যখন তোমরা কিতাব পাঠ করো? তোমরা কি চিন্তা করো না?"(সূরা আল-বাকারা, ৪৪)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করেছেন, যে ব্যক্তি দাওয়াত দেয় কিন্তু নিজে তা পালন করে না, সে আসলে নিজের কথার মর্যাদা নষ্ট করে। আমলবিহীন দাওয়াতের ফল হলো অবিশ্বাস ও দূরত্ব সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"কিয়ামতের দিনে এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার অন্ত্র বেরিয়ে আসবে, আর সে তা নিয়ে চক্রাকারে ঘুরবে, যেমন গাধা কলের পাটায় ঘুরে। তখন জাহান্নামের লোকেরা বলবে, 'তুমি তো আমাদের সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে!' সে বলবে, 'আমি সৎকাজের আদেশ দিতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজেই তা করতাম।'" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই ভয়াবহ পরিণতি দেখায়, দাওয়াত ও আমলের মধ্যে ফারাক থাকলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

একজন প্রকৃত দ্বায়ীর উচিত, প্রথমে নিজেকে সংশোধন করা, তারপর অন্যকে আহ্বান করা। তার জীবন যেন এমন হয়, যা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে, যদিও সে কথা না বলে। সাহাবায়ে কিরামরা দাওয়াত দিতেন তাদের আমলের মাধ্যমে। তাদের সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নম্রতা ও দয়া দেখে মানুষ ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ত। তারা বলতেন না "ইসলাম গ্রহণ করো", বরং তাদের চরিত্রই বলত, "এদের মতো হও।"

নিজেকে পরিশুদ্ধ না করলে অন্যকে পবিত্রতার দিকে আহ্বান সফল হয় না। আমলের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া মানে হলো : নিজের নামাজ ঠিক রাখা, সততার সঙ্গে লেনদেন করা, অন্যের প্রতি দয়া দেখানো, মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে দূরে থাকা, বিনয়ী ও নম্র আচরণ করা, নিজের পরিবারে দ্বীনের বাস্তব চর্চা করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"তোমাদের কেউ তখনই পূর্ণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে, তা তার ভাইয়ের জন্যও ভালোবাসে।"(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসের মাধ্যমে বোঝা যায়, একজন দ্বায়ীর উচিত নিজের হৃদয়ে অন্যের মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা রাখা। এটাই আমলের মাধ্যমে প্রকৃত দাওয়াত।

আমলভিত্তিক দাওয়াত মানুষের মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। বক্তৃতা বা তর্ক অনেক সময় ভুলে যায়, কিন্তু একটি উত্তম আচরণ মানুষের হৃদয়ে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়। যেমন, একজন দ্বায়ী যদি দোকানে গ্রাহকের সঙ্গে ন্যায়পরায়ণ ব্যবহার করে, বা অন্যের কষ্টে পাশে দাঁড়ায়, সে তখনই বাস্তবে ইসলাম শেখাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ

"আর আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন উত্তম কথা বলে, নিশ্চয়ই শয়তান তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে।"(সূরা আল-ইসরা ১৭:৫৩)

দ্বায়ীর কথাবার্তা ও আচরণ সবসময় উত্তম হওয়া উচিত। তিনি যেন এমনভাবে জীবন যাপন করেন, যাতে মানুষ তাঁর আমল দেখে ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে। আমলের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া মানে কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি নয়, বরং সমাজে দ্বীনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। প্রতিটি কাজই তখন দাওয়াত হয়ে যায়, তার পোশাক, তার কথা, তার হাসি, এমনকি তার নীরবতাও। তাই একজন দ্বায়ী যদি নিজের জীবনকে ইসলামের জীবন্ত উদাহরণ বানাতে পারে, তবে তার দাওয়াত নিঃশব্দেও প্রভাব ফেলবে।

৫.৩ আন্তরিকতা প্রকাশ করা

একজন দ্বায়ীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো আন্তরিকতা বা ইখলাস। আন্তরিকতা মানে হলো, দাওয়াতি কাজের মূল উদ্দেশ্য যেন শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়। দ্বায়ী কখনো নিজের নাম, খ্যাতি বা প্রশংসা পাওয়ার জন্য কাজ করবে না। বরং সে মনে করবে আমি যা করছি, তা আল্লাহর আদেশ পালনের অংশ। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ

"আর তারা আদিষ্ট হয়নি কিন্তু যেন আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর জন্য দ্বীনকে খাঁটি করে।" (সূরা আল-বাইয়্যিনাহ,৫)

এই আয়াত প্রমাণ করে, ইসলামী দাওয়াতে আন্তরিকতা সবচেয়ে বড় শর্ত। আন্তরিকতা ছাড়া দাওয়াত আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"নিশ্চয়ই সব কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" (বুখারি ও মুসলিম)

এই হাদীসের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, দ্বায়ীর সকল প্রচেষ্টা তখনই মূল্যবান, যখন তার নিয়ত সঠিক ও বিশুদ্ধ হয়। দ্বায়ীকে সর্বদা নিজের নিয়ত যাচাই করতে হবে। যদি তার মনে অহংকার, খ্যাতির লোভ বা মানুষের প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছা জন্ম নেয়, তাহলে তার কাজের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। আন্তরিক দ্বায়ী কখনো অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দাওয়াত দেয় না। বরং সে নিঃশব্দে, বিনয়ের সাথে সত্যের বার্তা পৌঁছে দেয়। এমন দ্বায়ী নিজের আমলের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়, কথার মাধ্যমে নয়। সে মানুষের দোষ না দেখে নিজের সংশোধনে বেশি মনোযোগী হয়। আন্তরিকতা দ্বায়ীকে বিনয়ী ও ধৈর্যশীল করে তোলে। আন্তরিক ব্যক্তিকে আল্লাহ নিজেই সঠিক পথে পরিচালিত করেন। দ্বায়ীকে মনে রাখতে হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দাওয়াত দেওয়া মানে মানুষের উপকার করা। আন্তরিক দ্বায়ী কখনো কারো ভুল ধরিয়ে অপমান করে না, বরং নরমভাবে সত্য কথা বলে। তিনি অন্যের উপরে প্রভাব বিস্তার নয়, বরং হৃদয়ে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। আন্তরিকতার ফলে তার কথায় ও কাজে আল্লাহ বরকত দান করেন। এমন দ্বায়ী কখনো হতাশ হয় না, কারণ সে জানে, ফলাফল আল্লাহর হাতে। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

ۙ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۟

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের সৎকাজের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" (সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১২০)

একজন আন্তরিক দ্বায়ী জানে, তার কাজ হয়তো মানুষের চোখে ছোট, কিন্তু আল্লাহর কাছে তা মূল্যবান। আন্তরিক দ্বায়ী নিজের দোষ ঢেকে অন্যের ভালো খোঁজেন। তিনি নিজের আমল লুকিয়ে রাখেন, যেন রিয়া বা দেখানোর প্রবণতা না আসে। দাওয়াতের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর সাহায্য চান। আন্তরিকতা তার দাওয়াতকে ফলপ্রসূ ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তাই দ্বায়ীর উচিত প্রতিদিন নিজের অন্তর পরিশুদ্ধ রাখা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ লক্ষ্য বানানো।

৫.৪ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা

একজন দ্বায়ীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা। দাওয়াতের কাজ মূলত আল্লাহর পথের কাজ, তাই তাঁর সাহায্য ছাড়া এটি সফল হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ

"তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, তিনি তোমাদের স্মরণ করবেন।" (সূরা আল-বাকারা,১৫২)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখলে আল্লাহও তাঁর বান্দার প্রতি সাড়া দেন। দ্বায়ীকে সবসময় নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখতে হবে। সালাতই হলো বান্দা ও প্রভুর মধ্যে যোগাযোগের সর্বোত্তম মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
"নামাজই মুমিনের মিরাজ।" (বায়হাকি)
অর্থাৎ নামাজের মাধ্যমে দ্বায়ী আল্লাহর নিকটে পৌঁছায়। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হলে দাওয়াতের কাজ সহজ হয়। দ্বায়ীকে দোয়ার মাধ্যমে নিয়মিত আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। কারণ দাওয়াতের প্রকৃত শক্তি আসে আল্লাহর কাছ থেকে। আল্লাহ বলেন,

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

'তোমরা যদি আমার সাহায্য চাও, ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও।" (সূরা আল-বাকারা, ৪৫)

এই আয়াত দ্বায়ীকে শেখায়, দাওয়াতের কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে নামাজে আল্লাহর সাহায্য নিতে হবে। একজন দ্বায়ী যখন আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তখন তার অন্তরে প্রশান্তি আসে। সে মানুষের রাগ, অবজ্ঞা বা উপহাসে ভীত হয় না। বরং সে আল্লাহর উপর নির্ভর করে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যায়। এই ভরসাই দ্বায়ীর সবচেয়ে বড় শক্তি। দ্বায়ীকে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর বাণীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে। কারণ কুরআন তার জন্য দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণার উৎস। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত রাতে কিয়ামুল লাইল আদায় করতেন, যা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার অন্যতম উপায়। দ্বায়ীকে নফল ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হতে হবে, যেমন রোজা রাখা, দান করা ও দোয়া করা। এ সব আমল তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী করে তোলে। একজন দ্বায়ী যদি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক হারায়, তবে তার দাওয়াত নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কারণ অন্তর আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে দাওয়াতের প্রেরণাও

নিঃশেষ হয়। দ্বায়ীর উচিত আল্লাহর নামসমূহ নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। কৃতজ্ঞ হৃদয়ই আল্লাহর ভালোবাসা পায়। দ্বায়ীকে সবসময় আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসার মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। ভয় তাকে পাপ থেকে দূরে রাখে, আর ভালোবাসা তাকে ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করে। আন্তরিক দ্বায়ী যখন কাঁদে, তখন তা কেবল আল্লাহর সামনে। যখন সে হাসে, তখন তা আল্লাহর রহমতের কারণে। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক যত দৃঢ় হবে, দ্বায়ীর দাওয়াত তত প্রভাবশালী হবে। এমন দ্বায়ীর মুখে আল্লাহ বরকত দান করেন, তার কথায় প্রভাব সৃষ্টি হয়। সে কখনো মানুষের ক্ষোভ বা প্রতিক্রিয়ায় ভীত হয় না। তার হৃদয়ে থাকে এই বিশ্বাস,

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

"নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য।" (সূরা আল-আনআম,১৬২)

এমন দ্বায়ী সত্যিকার অর্থে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করে।

৫.৫ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা

একজন দ্বায়ীর জন্য সবচেয়ে বড় দিকনির্দেশনা হলো কুরআন ও সুন্নাহ। কারণ দাওয়াতের মূল উৎসই হলো আল্লাহর কিতাব ও নবীজির জীবনাদর্শ। দ্বায়ী যদি এই দুই নির্দেশনা থেকে বিচ্যুত হয়, তবে তার দাওয়াত ফলপ্রসূ হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ

"আর নিশ্চয়ই এ কুরআন এমন পথ দেখায়, যা সবচেয়ে সোজা।" (সূরা আল-ইসরা, ৯)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, কুরআন দ্বায়ীর জন্য পথপ্রদর্শক ও আলোর উৎস। দ্বায়ীর উচিত কুরআন নিয়মিত পড়া, বোঝা ও জীবনে প্রয়োগ করা। শুধু তিলাওয়াত নয়, বরং আয়াতের অর্থ বুঝে তা বাস্তবে রূপ দেওয়া দ্বায়ীর দায়িত্ব। নবী করিম ﷺ ছিলেন জীবন্ত কুরআন। আয়েশা (রা.) বলেছেন,
"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রই ছিল কুরআন।" (সহিহ মুসলিম)

অতএব দ্বায়ীর চরিত্রও হতে হবে কুরআনের প্রতিফলন। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী তিনি ন্যায়পরায়ণ, বিনয়ী ও সহনশীল হবেন। পাশাপাশি দ্বায়ীর জন্য আবশ্যক হলো সুন্নাহর অনুসরণ করা। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বলেছেন,

"আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরো, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না একটি আল্লাহর কিতাব, অন্যটি আমার সুন্নাহ।" (মুয়াত্তা মালেক)

এই হাদীস প্রমাণ করে, কুরআন ও সুন্নাহ একে অপরের পরিপূরক। দ্বায়ী যদি শুধুমাত্র কুরআনের কথা বলে কিন্তু নবীর জীবন অনুসরণ না করে, তবে তার দাওয়াত অসম্পূর্ণ। কারণ নবীজির জীবনই কুরআনের বাস্তব রূপ। দ্বায়ীকে নবীর আদব, ধৈর্য ও দাওয়াতের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। নবী ﷺ কষ্টের মধ্যেও হাসিমুখে মানুষকে আহ্বান করতেন। তিনি কখনো কারো প্রতি ঘৃণা বা অভিশাপ দিতেন না। বরং দোয়া করতেন, যেন তারা সঠিক পথে আসে। দ্বায়ীরও উচিত এই গুণ অর্জন করা। দ্বায়ীকে নিজের বক্তব্য ও কাজ সবসময় কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাচাই করতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ তাকে ভুল পথ থেকে রক্ষা করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। আধুনিক যুগের দ্বায়ীকে প্রযুক্তি ব্যবহার করলেও ইসলামী আদর্শে অটল থাকতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহর নীতির বাইরে গিয়ে কখনো জনপ্রিয়তার জন্য দাওয়াত দেওয়া উচিত নয়। দ্বায়ী যদি এই দুই উৎসকে মেনে চলে, তবে তার কথায় প্রভাব ও হৃদয়ে আলো জন্মায়। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ দ্বায়ীকে অহংকার থেকে দূরে রাখে। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۟

"যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, সে বড় সাফল্য অর্জন করেছে।" (সূরা আল-আহযাব, ৭১)

এই সাফল্যই দ্বায়ীর আসল পুরস্কার। দ্বায়ীর দাওয়াত সফল হয় যখন সে কুরআনের আলোয় মানুষের জীবন আলোকিত করে এবং নবীর সুন্নাহর পথ অনুসরণ করে সমাজে আদর্শ স্থাপন করে। তাই একজন দ্বায়ীর জীবনের প্রতিটি কাজ, কথা ও সিদ্ধান্তে কুরআন ও সুন্নাহর ছাপ থাকা আবশ্যক।

৫.৬ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা

একজন দ্বায়ীর প্রধান দায়িত্ব হলো মানুষকে সৎকাজে উৎসাহিত করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা। এটি দাওয়াতের মূল আত্মা ও ইসলামী সমাজ গঠনের ভিত্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

"তোমরা একে অপরকে সৎকাজে আদেশ করো ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো।" (সূরা আলে ইমরান, ১১০)

এই আয়াতে আল্লাহ মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বলেছেন, কারণ তারা সৎ কাজে উৎসাহ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। দ্বায়ীর উচিত মানুষকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করা। যেমন নামাজ, রোজা, সত্যবাদিতা, দানশীলতা ও ন্যায়নিষ্ঠা। একইসঙ্গে তাকে অন্যায়, মিথ্যা, প্রতারণা, গীবত ও অশ্লীলতা থেকে মানুষকে দূরে রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে যারা কোনো অন্যায় কাজ দেখবে, সে যেন তা হাতে পরিবর্তন করে, যদি না পারে, তাহলে মুখে, আর যদি তাও না পারে, তাহলে অন্তরে ঘৃণা করবে, আর সেটাই ঈমানের দুর্বলতম স্তর।" (সহিহ মুসলিম)

এই হাদীস দ্বায়ীর দায়িত্ব কতটা গুরুতর তা স্পষ্ট করে। দ্বায়ীকে সাহসিকতার সঙ্গে সত্য কথা বলতে হবে, তবে তা যেন কোমল ও প্রজ্ঞাপূর্ণ হয়।

অতএব দ্বায়ীকে সৎকাজের আহ্বান দিতে হবে এমনভাবে, যাতে মানুষ বিরক্ত না হয়ে অনুপ্রাণিত হয়। অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার সময় তাকে রূঢ় না হয়ে সহানুভূতিশীল হতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবসময় নরমভাবে উপদেশ দিতেন, কঠোর আচরণ করতেন না। দ্বায়ীর উচিত প্রথমে নিজেকে সংশোধন করা, তারপর অন্যকে দাওয়াত দেওয়া। কারণ নিজের জীবনে যদি সৎকাজ না থাকে, তবে তার কথায় প্রভাব জন্মায় না। কুরআন সতর্ক করে বলেছে,

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

"তোমরা কি মানুষকে সৎকাজে আহ্বান করবে, অথচ নিজেদের ভুলে যাবে?" (সূরা আল-বাকারা, ৪৪)

এই আয়াত দ্বায়ীকে আত্মসমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করে। দ্বায়ীকে সবসময় ন্যায় ও সত্যের পক্ষে দৃঢ় থাকতে হবে, যদিও তাতে কষ্ট আসে। সৎকাজে আদেশ করা মানে শুধু মুখে বলা নয়, বরং কাজের মাধ্যমে উদাহরণ সৃষ্টি করা। অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা মানে কটাক্ষ নয়,

বরং ভালো বিকল্প উপস্থাপন করা। দ্বায়ী সমাজের মন্দ দিকগুলো চিহ্নিত করে তা সংশোধনের উদ্যোগ নেবে। সৎকাজে উৎসাহ দিলে সমাজে শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অসৎ কাজ বন্ধ হলে সমাজ থেকে হিংসা, অন্যায় ও দুর্নীতি দূর হয়।
দ্বায়ীকে ধৈর্যশীল হতে হবে, কারণ মানুষ সবসময় তার উপদেশ সহজে গ্রহণ করে না। তাকে আল্লাহর পুরস্কারের আশায় কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এই প্রতিশ্রুতি দ্বায়ীর জন্য সর্বোচ্চ অনুপ্রেরণা। তাই একজন আদর্শ দ্বায়ী সবসময় সত্যের পথে দৃঢ় থাকে, অন্যায় থেকে দূরে রাখে এবং সমাজে আল্লাহভীতির বীজ বপন করে। এভাবেই সে হয়ে ওঠে বাস্তবিক অর্থে "দ্বায়ী" আল্লাহর পথে আহ্বানকারী একজন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

৫.৭ বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা

একজন দ্বায়ীর অন্যতম দায়িত্ব হলো মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা। ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা একতা, ভালোবাসা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

"নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।" (সূরা আল-হুজুরাত, ১০)

এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মুমিনদের মধ্যে সম্পর্ক ভাইয়ের মতো হওয়া উচিত। দ্বায়ীর কাজ হলো এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করা এবং বিভাজন দূর করা। সে কখনো বিভেদ, ঘৃণা বা হিংসা ছড়াবে না, বরং ভালোবাসা ও সহমর্মিতার বার্তা ছড়াবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
"তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, বরং আল্লাহর বান্দারা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকো।" (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)
এই হাদীস দ্বায়ীর জন্য এক মহান নির্দেশনা। দ্বায়ীর উচিত মানুষের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করা। ধর্ম, সমাজ বা জাতি নির্বিশেষে পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখা। কারণ দাওয়াত তখনই সফল হয়, যখন সমাজে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ থাকে। বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব মানুষের অন্তরকে নরম করে, যা সত্য গ্রহণে সহায়তা করে। দ্বায়ীকে এমন আচরণ করতে হবে, যাতে মানুষ তার কাছ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করে। নবী করিম ﷺ বলেছেন,
"মুসলমান সেই, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।" (সহিহ বুখারি)

এই নিরাপত্তা দাওয়াতের মূল নীতি। দ্বায়ী যদি নিজে নরম ও সহানুভূতিশীল হয়, তাহলে মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে মানুষের ভুলে কঠোর না হয়ে ভালোবাসা ও ধৈর্যের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করবে। বন্ধুত্বের মাধ্যমে দাওয়াত সহজ হয়, কারণ বন্ধুদের মধ্যে বিশ্বাস থাকে। কুরআন বলে,

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ

"আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।" (সূরা আলে ইমরান, ১৫৯)

অতএব দ্বায়ীর হৃদয় কোমল ও দয়ালু হতে হবে। সে অন্যের প্রতি ক্ষমাশীল হবে, কারণ ক্ষমাই ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি। দ্বায়ী মানুষের দুঃখে পাশে থাকবে, আনন্দে অংশ নেবে এবং কারও প্রতি ঊর্ধ্বতন আচরণ করবে না। ভ্রাতৃত্ব তখনই টিকে, যখন পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা থাকে। আল্লাহ বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

"তোমরা সবাই আল্লাহর দড়ি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিভক্ত হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান, ১০৩)

এই আয়াত দ্বায়ীর দাওয়াতি জীবনের দিকনির্দেশনা দেয়, ঐক্যই শক্তি। দ্বায়ীর উচিত মুমিনদের মধ্যে ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়া এবং অহংকারের পরিবর্তে বিনয় সৃষ্টি করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"তোমরা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না একে অপরকে ভালোবাসবে।" (সহিহ মুসলিম)

ভালোবাসা ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না, এই শিক্ষা দ্বায়ীর মনে গভীরভাবে গেঁথে থাকা উচিত। দ্বায়ীকে এমনভাবে মানুষকে একত্র করতে হবে, যাতে তারা আল্লাহর পথে একসাথে অগ্রসর হয়। সে সমাজে হিংসা, বিদ্বেষ বা দলাদলি নয়, বরং ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বীজ বপন করবে। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলে সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দ্বায়ী নিজে উদাহরণ হয়ে দেখাবে, কীভাবে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামী দাওয়াতকে সফল করে। তাই আদর্শ দ্বায়ী সেই, যিনি বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেন এবং সমাজে ঐক্যের মশাল প্রজ্বলিত করেন।

অধ্যায় ৬ : দ্বায়ীর সফলতা লাভের উপায়

একজন দ্বায়ীর মূল লক্ষ্য হলো দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তবে দাওয়াত কার্যকর হতে হলে শুধুমাত্র প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়, সঠিক পদ্ধতি ও নিকট আত্মীয় থেকে শুরু করে ধৈর্য, জ্ঞান ও আন্তরিকতা আবশ্যক। দ্বায়ীকে সর্বদা মনে রাখতে হবে, সফলতা কেবল আল্লাহর ইচ্ছায় সম্ভব। আল্লাহ নিজের দিকে আহ্বানকারীকে সহায়তা করবেন। দ্বায়ীকে ইখলাস বা আন্তরিকতা তার কাজের মূল ভিত্তি হিসেবে রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয়ই সব কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" (বুখারি ও মুসলিম)

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, নিয়ত শুদ্ধ হলে আমল গ্রহণযোগ্য হয়। দ্বায়ীকে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে, কারণ মানুষের শক্তি সীমিত। এছাড়া শার'ঈ জ্ঞান অর্জন করা জরুরি, যাতে সে সঠিক দাওয়াত দিতে পারে। বিদআত, পাপাচার ও গোমরাহীর মজলিস ত্যাগ করাও দ্বায়ীর সফলতার জন্য অপরিহার্য। কারণ খারাপ প্রভাব থেকে দূরে থাকলে মন ও ইচ্ছা সৎ কাজের দিকে থাকে। দ্বায়ীকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো থেকেই দাওয়াত শুরু করতে হবে।

অতএব গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে মনোযোগী হওয়া দ্বায়ীর কাজকে ফলপ্রসূ করে। দ্বায়ীকে প্রথমে নিকট আত্মীয় ও পরিচিতদের দাওয়াত দেওয়া উচিত। কারণ কাছের মানুষকে প্রভাবিত করা সহজ এবং তাদের মাধ্যমে সমাজে দাওয়াত ছড়িয়ে যায়। দ্বায়ীকে অধিকাংশ সময় দাওয়াতে ব্যয় করতে হবে এবং অবিরাম প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা স্তরে দাওয়াত সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়, তা সর্বত্র বিস্তৃত হওয়া দরকার। দাওয়াত প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট হওয়া জরুরি, যাতে কেউ বিভ্রান্ত না হয়। একজন সফল দ্বায়ী কখনো হতাশ হয় না, কারণ সে জানে ফলাফল আল্লাহর হাতে।

দ্বায়ীকে ধৈর্যশীল ও নম্র হতে হবে, যাতে মানুষ তার বার্তায় আকৃষ্ট হয়। প্রযুক্তি ও অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করলেও ইসলামিক নীতি মানা বাধ্যতামূলক। সফল দ্বায়ীর জন্য আবশ্যক, তিনি নিজের চরিত্রে আল্লাহভীত এবং সততা বজায় রাখবেন। সে কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থ বা খ্যাতির জন্য দাওয়াত দিবে না। তার লক্ষ্য কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহর সাহায্য ও দিকনির্দেশনা ছাড়া দাওয়াত কখনো পুরোপুরি সফল হয় না। তাই দ্বায়ীর জন্য ইখলাস, জ্ঞান, ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর ভরসা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একথা মনে রেখে দ্বায়ী সমাজে সত্য ও ন্যায়ের পথে দাওয়াতের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠতে পারে।

৬.১ ইখলাস (নিষ্কলুষ নিয়ত)

ইখলাস বা আন্তরিকতা হলো দ্বায়ীর সফলতার মূল চাবিকাঠি। একজন দ্বায়ী তার দাওয়াত কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে। কুরআন বলে,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ

"আর তারা আদিষ্ট হয়নি কিন্তু যেন আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর জন্য দ্বীনকে খাঁটি করে।" (সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, আয়াত ৫)

এই আয়াত ইখলাসের গুরুত্ব স্পষ্ট করে। দ্বায়ী কখনো মানুষের প্রশংসা বা খ্যাতির জন্য দাওয়াত দেবে না। তিনি জানেন, মানুষের প্রশংসা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি চিরস্থায়ী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"নিশ্চয়ই সব কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" (বুখারি ও মুসলিম)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, কাজের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের উপর নির্ভর করে। দ্বায়ীর কাজের উদ্দেশ্য সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি হওয়া উচিত। ইখলাস থাকলে তার দাওয়াত পরিশীলিত ও প্রভাবশালী হয়। তিনি মানুষের সমালোচনায় হতাশ হবেন না। বরং আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা রাখবেন। দ্বায়ীকে নিজের অন্তরপরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হৃদয়ের মধ্যে রিয়া বা দেখানোর প্রবণতা থাকা যাবে না। ইখলাস দ্বায়ীকে ধৈর্যশীল ও নম্র করে তোলে। ইখলাস ছাড়া দাওয়াত কখনো পুরোপুরি সফল হয় না। দ্বায়ী প্রতিদিন নিজেকে যাচাই করবে, তার কাজের উদ্দেশ্য কি সত্যিই আল্লাহর জন্য। অন্তরের খাঁটিতা নিশ্চিত হলে তার দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হয়। ইখলাস তাকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও স্থির রাখে। সে জানে, মানুষের প্রতিক্রিয়া আলাদা হতে পারে, কিন্তু ফলাফল আল্লাহর হাতে। দ্বায়ী যখন ইখলাসের সঙ্গে দাওয়াত দেয়, তখন তার কথার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তার হৃদয় শান্ত থাকে এবং অহংকার দূরে থাকে। ইখলাস তার আমলকে আল্লাহর বরকত ও মেরাজে পরিণত করে। দ্বায়ী সবসময় আল্লাহর সাহায্য ও দিকনির্দেশনা প্রার্থনা করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দ্বায়ী সব ধরনের স্বার্থ পরিত্যাগ করে। ইখলাস মানুষকে অনুপ্রাণিত করে সত্য পথ অনুসরণে। এমন দ্বায়ী সমাজে সত্য ও ন্যায়ের বার্তা ছড়িয়ে দেয়। ইখলাস ছাড়া দাওয়াত শুধু রেওয়াজ বা শৃঙ্খলার কাজ হয়ে যায়। দ্বায়ীর ইখলাস তাকে আল্লাহর দৃষ্টি ও বরকত অর্জনের মাধ্যমে সফল করে। তাই একজন আদর্শ দ্বায়ী সর্বদা খাঁটি মনোভাব ও ইখলাস বজায় রাখে।

৬.২ আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা

একজন দ্বায়ীর সফলতার অন্যতম ভিত্তি হলো আল্লাহর কাছে সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করা। দ্বায়ী জানে, মানুষের শক্তি সীমিত, তাই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া দাওয়াতের প্রকৃত ফল আসে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ

"যদি তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।" (সূরা আল-বাকারা, ১৫২)

এই আয়াত দায়িত্বশীলদের জন্য আশ্বাস যে, আল্লাহ সাহায্য করবেন। দ্বায়ী নিয়মিত দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর দিকনির্দেশনা চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
"প্রত্যেক বিশ্বাসীকে প্রত্যেক মুহূর্তে দোয়া করা উচিত।" (তিরমিজি)
এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, দোয়া ছাড়া দাওয়াত অসম্পূর্ণ। দ্বায়ীকে সবসময় বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। সে জানে, আল্লাহই তার প্রতিটি কাজের নিয়ন্ত্রক। আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা দ্বায়ীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। এটি তাকে ধৈর্যশীল ও স্থির রাখে। দাওয়াতের পথে বাধা ও কষ্ট আসলেও সে হতাশ হয় না। দোয়া তার অন্তরকে প্রশান্তি দেয় এবং আল্লাহর নিকটস্থ করে। দ্বায়ীকে সৎকর্মের পরিকল্পনায় আল্লাহর সাহায্য চাওয়া উচিত। আল্লাহ বলেন,

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ

"তুমি ধৈর্য ধরো, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহর সাহায্যেই।" (সূরা নাহল,১২৭)

তাই দাওয়াতের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর উপর নির্ভরতা থাকতে হবে।
দ্বায়ী জানে, মানুষের প্রশংসা বা সমালোচনা তার কাজের ফল পরিবর্তন করে না। আল্লাহর দিকনির্দেশনা ও সাহায্য ছাড়া সত্য প্রচার সম্ভব নয়। দ্বায়ী দোয়ার মাধ্যমে নিজের ও সমাজের কল্যাণ চায়। আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা তাকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও স্থির রাখে। সে জানে, ফলাফল আল্লাহর হাতে, তার কর্তব্য শুধু প্রচেষ্টা। দোয়া দ্বায়ীর নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে। এটি তাকে নিষ্ঠা ও সততার পথে রাখে। দ্বায়ী যখন আল্লাহর সাহায্য চায়, তখন আল্লাহও তার পথে সহায়ক হন। দ্বায়ীকে সবসময় মনোযোগী থাকতে হবে, কারণ আল্লাহর সাহায্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সঙ্গে আসে। দোয়া ছাড়া কোনো আমল সম্পূর্ণ নয়। আল্লাহর নিকট নিরন্তর প্রার্থনা তাকে প্রভাবশালী ও সফল দ্বায়ী বানায়। তাই একজন আদর্শ দ্বায়ী সবসময় আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তার দাওয়াতকে সফল করার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

৬.৩ শার'ঈ জ্ঞানে পারদর্শী হওয়া

একজন দ্বায়ীর সফলতার জন্য শার'ঈ জ্ঞানে পারদর্শী হওয়া অত্যন্ত জরুরি। দাওয়াত কার্যকর করতে হলে কেবল মনোভাব বা ইচ্ছা যথেষ্ট নয়, যথাযথ জ্ঞানও থাকা প্রয়োজন। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

"(তাদের প্রেরণ করেছি) স্পষ্ট প্রমাণাদি ও কিতাবসমূহ এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যাতে তারা চিন্তা করে।"(আন-নাহল, ৪৪)

এই আয়াত প্রমাণ করে,সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা দাওয়াতের জন্য অপরিহার্য। দ্বায়ীকে ইসলামের মূল নীতি, কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সে জানবে কোন কাজ সঠিক, কোন কাজ অসৎ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহর পথে মানুষের উপকারে লাগে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত প্রস্তুত করেন।" (সহিহ তিরমিজি)
এই হাদীস প্রমাণ করে, জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। দ্বায়ীকে হাদিস, কুরআন ও ফিকহ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এমনকি বর্তমান যুগের প্রযুক্তি ও সমাজ অনুযায়ী জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হবে। জ্ঞান ছাড়া দায়িত্বশীল দাওয়াত অসম্পূর্ণ হয়। দ্বায়ীকে শিক্ষার্থী, যুবক ও অভিজ্ঞ সবাইকে সমানভাবে দাওয়াত দিতে হবে। জ্ঞান থাকা তাকে বিভ্রান্তি ও ভুল থেকে রক্ষা করে। শার'ঈ জ্ঞানের মাধ্যমে দ্বায়ী ন্যায্য ও বৈধ পদ্ধতিতে দাওয়াত দিতে পারে। আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"এটি আল্লাহর দিকনির্দেশনা, তুমি তাই অনুসরণ করো।" (সূরা আননাহল, ১২৩)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, জ্ঞান ছাড়া দাওয়াতের পথ সুস্পষ্টভাবে চলা সম্ভব নয়। দ্বায়ীকে প্রতিনিয়ত নিজের জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে হবে। সে নিয়মিত কুরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করবে। এছাড়া ফতোয়া ও ভুল ধারণার পার্থক্য বুঝতে হবে। দ্বায়ীকে বিদআত ও মিথ্যা ধর্মীয় প্রচারণা থেকে দূরে থাকতে হবে। জ্ঞান ছাড়া মানুষকে সঠিক পথে চালিত করা

সম্ভব নয়। তাই শার'ঈ জ্ঞানে পারদর্শী দাওয়াতকে প্রভাবশালী ও গ্রহণযোগ্য করে। দ্বায়ীকে জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে ধৈর্য, নম্রতা ও আন্তরিকতা বজায় রাখতে হবে। প্রতিটি সিদ্ধান্তে ইসলামের নীতি মানা অপরিহার্য। জ্ঞান ছাড়াই দ্বায়ী কেবল আবেগ বা অনুভূতির ওপর দাওয়াত করলে ফলাফল সীমিত হয়। শার'ঈ জ্ঞান তাকে সফল ও সঠিক পথের দাওয়াতি নেতা করে তোলে। দ্বায়ীকে সবসময় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে, যাতে জ্ঞান সঠিকভাবে প্রয়োগ হয়। আল্লাহ বলেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"যারা আমার নিদের্শ অনুসরণ করে, আমি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করব।" (সূরা বাকারা,৩৮)

দ্বায়ীর শার'ঈ জ্ঞান তাকে মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতে সক্ষম করে। তাই একজন আদর্শ দ্বায়ী সর্বদা জ্ঞান সমৃদ্ধ, সতর্ক ও দাওয়াতের কাজে দক্ষ থাকে।

৬.৪ বিদআত, পাপাচার ও গোমরাহীর মজলিস ত্যাগ করা

একজন দ্বায়ীর সফলতার জন্য অত্যন্ত জরুরি যে সে বিদআত, পাপাচার ও গোমরাহীর মজলিস থেকে দূরে থাকবে। কারণ নেতিবাচক পরিবেশ তার দাওয়াতকে দুর্বল করে এবং মনকে ম্লান করে। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"হে মুমিনগণ! যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের আহ্বান করেন সেই বিষয়ে, যা তোমাদের জীবন দান করে, তখন তোমরা সেই আহ্বানে সাড়া দাও। জেনে রাখো, আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মধ্যবর্তী হয়ে যান, এবং তোমরা অবশ্যই তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।"(সূরা আনফাল, আয়াত ২৪)

এই আয়াত প্রমাণ করে, পরিবেশ দ্বায়ীর সফলতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বায়ীকে সবসময় পাপ ও অন্যায় কার্যক্রমের মজলিস ত্যাগ করতে হবে। বিদআতের মজলিসে থাকা তার ঈমান ও জ্ঞানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। নবী করিম ﷺ বলেছেন,
"পাপাচারী লোকের সঙ্গে সমাগম করো না, কারণ তারা তোমার অন্তরকে দূষিত করবে।" (সহিহ মুসলিম)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, নেতিবাচক সঙ্গের প্রভাব কত গভীর। দ্বায়ীকে এমন সব সমাজ ও অবস্থান থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে যেখানে বিদআত ও অন্যায় প্রচলিত। পাপাচারী সমাজে থাকা মানে আল্লাহর সাহায্য থেকে দূরে থাকা। দ্বায়ীকে সতর্ক থাকতে হবে যে তার দাওয়াতের প্রভাব ক্ষুণ্ণ না হয়। সে নিজের চরিত্রকে সবসময় পরিশুদ্ধ রাখবে। গোমরাহী ও মন্দের সাথে মিশলে মানুষ ভুল পথে যায়। সঠিক পরিবেশ ছাড়া দাওয়াত সফল হয় না। দ্বায়ীকে পরামর্শ দেওয়া উচিত, কিন্তু নিজেও সতর্ক থাকতে হবে। পাপাচার ও বিদআতের প্রভাব তার দাওয়াতি শক্তি হ্রাস করে। সে নিজের চারপাশে আল্লাহভীতি ও নৈতিকতা বজায় রাখবে। নেতিবাচক মজলিস থেকে দূরে থাকা তাকে স্থিরচেতা ও স্থিরভাবে দাওয়াত চালাতে সাহায্য করে। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থির রাখতে, এসব মন্দ প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। নবী ﷺ সবসময় সৎ ও ধার্মিক মানুষের সঙ্গে থাকতেন। দ্বায়ীও সেই পথে চলবে। সে জানে, সমাজের নেতিবাচক প্রভাব মানুষকে বিভ্রান্ত করে। সে নিজের অন্তর, ইচ্ছা ও কর্মকে পরিশুদ্ধ রাখবে। এমন দায়িত্বশীল ব্যক্তি তার দাওয়াতে সফল হয়। সে সবসময় সতর্ক থাকবে, নেতিবাচক প্রভাব থেকে দূরে থাকবে এবং নিজের দাওয়াতকে সফল করবে। পাপাচার ও বিদআতের মজলিস ত্যাগ করাই একজন আদর্শ দ্বায়ীর অপরিহার্য গুণ।

৬.৫ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দ্বারা সূচনা করা

একজন দ্বায়ীর সফলতার জন্য সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে দাওয়াত শুরু করা। কারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানুষের মন ও হৃদয়ে দ্রুত প্রভাব ফেলে। দ্বায়ীকে প্রথমে এমন বিষয় থেকে শুরু করতে হবে যা মানুষের জীবন পরিবর্তন করতে পারে। নবী করিম ﷺ সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ নীতির দিকে দাওয়াত দিতেন। তার শিক্ষাগুলো মানুষের মৌলিক বিশ্বাস ও আচরণকে প্রভাবিত করত। দ্বায়ীও এমন পদ্ধতি অবলম্বন করবে। সে জানে, প্রথমে ছোট বা গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হলে মানুষ তাড়াহুড়া করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানুষের হৃদয়ে আলোর মতো প্রভাব ফেলে। দ্বায়ীকে বিষয় নির্বাচন করতে হবে, যা মানুষের আত্মা ও জ্ঞানকে প্রভাবিত করে। দ্বায়ী প্রথমেই ঈমান, নামাজ, শিরক থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি মৌলিক বিষয় নিয়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য সৎ কাজের দিকে দাওয়াত বিস্তার করবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জোর দিলে মানুষের মনোযোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়। দ্বায়ীকে লক্ষ্য রাখতে হবে, মানুষের মনোযোগ ও আগ্রহ ধরে রাখার জন্য বিষয় সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকেই তিনি দাওয়াত শুরু করতেন। এটি মানুষের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলে। দ্বায়ী যখন গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় নিয়ে দাওয়াত শুরু করে, তখন তার বার্তা গ্রহণযোগ্য হয়। সে জানে, সময় ও শক্তি সীমিত, তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফোকাস অপরিহার্য।

সত্যবাদী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো মানুষের অন্তরে আলোর মত প্রভাব ফেলে। দ্বায়ী প্রথমেই মৌলিক নৈতিকতা, সততা ও আল্লাহভীতি প্রসারিত করবে। এরপর অন্যান্য বিষয়ে দাওয়াত সম্প্রসারণ করবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকেই শুরু করলে মানুষের পরিবর্তন দ্রুত সম্ভব হয়। দ্বায়ীর কাজ সুগঠিত, পরিকল্পিত ও কার্যকর হয়। সে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে ধৈর্য সহকারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দাওয়াত চালাবে। একজন আদর্শ দ্বায়ী সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকেই দাওয়াত শুরু করে, যাতে তার প্রচেষ্টা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সমাজের কল্যাণে পরিণত হয়।

৬.৬ নিকট আত্মীয়দের থেকে শুরু করা

একজন দ্বায়ীর সফলতার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত তার নিকট আত্মীয়দের দাওয়াত। কারণ কাছের মানুষকে প্রভাবিত করা সহজ এবং তাদের পরিবর্তন সমাজে বিস্তার লাভ করে। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۙ

“আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়দেরকে স্মরণ করিয়ে দিন।” (সূরা আশ-শুআরা, ২১৪)

এই আয়াত প্রমাণ করে, নিকট আত্মীয়দের প্রাথমিক লক্ষ্য করা জরুরি। নবী করিম ﷺ প্রথমে তার পরিবার, আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠদের দাওয়াত দিতেন। তাদের প্রতি দয়া, ভালোবাসা ও ধৈর্য দেখিয়ে মানুষ পরিবর্তনের পথ গ্রহণ করত। দ্বায়ীও প্রথমে পরিবার ও আত্মীয়দেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করবে। কারণ তাদের প্রভাব ও সম্মান দিয়ে দাওয়াত দ্রুত প্রসারিত হয়। নবী ﷺ বলেন,

“প্রথমেই তোমার নিকটতম মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করো।” (তিরমিজি)

এই হাদীস দ্বায়ীর জন্য নির্দেশ দেয়, নিকট আত্মীয়রা যদি সঠিক পথে আসে, সমাজে উদাহরণ স্থাপন হয়। দ্বায়ীকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ আত্মীয়দের প্রতি কঠোরতা মানুষকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। সে ধৈর্য, নম্রতা ও সদ্ব্যবহার ব্যবহার করবে।

দাওয়াত কেবল কথার মাধ্যমে নয়, আমলের মাধ্যমে দেওয়া উচিত। দ্বায়ী প্রথমে নামাজ, ইমান ও ভালো কাজের দাওয়াত দিবে। এরপর ধীরে ধীরে সমাজের অন্যান্য মানুষদের দিকে দাওয়াত বিস্তার করবে। আত্মীয়দের থেকে শুরু করলে তিনি তাদের প্রভাব ও সহযোগিতা পাবে। এই পদ্ধতি দাওয়াতের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। দ্বায়ীকে সবসময় প্রার্থনা ও

দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া উচিত। নবী ﷺ সবসময় পরিবারকে আগে দাওয়াত দিতেন, কারণ এটি সবচেয়ে প্রভাবশালী। দ্বায়ী যখন আত্মীয়দেরকে সঠিক পথে আনবে, তারা অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে। এতে সমাজে সত্য ও ন্যায়ের বিস্তার হবে। দ্বায়ীর কাজ ধারাবাহিক, সুসংগঠিত এবং ফলপ্রসূ হয়। আত্মীয়দের দাওয়াত সফল হলে সমাজে প্রভাব বৃদ্ধি পায়। দ্বায়ীকে সতর্ক ও ধৈর্যশীল থাকতে হবে। নিজের উদাহরণ দেখিয়ে সে তাদের হৃদয় আলোকিত করবে। একজন আদর্শ দ্বায়ী সর্বদা নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে দাওয়াত শুরু করে, যাতে সমাজে সত্য ও ন্যায়ের দিগন্ত বিস্তৃত হয়।

৬.৮ নির্দিষ্ট এলাকা বা স্তরে দাওয়াত সীমাবদ্ধ না করা

একজন দ্বায়ীর সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে সে তার দাওয়াতকে কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা স্তরে সীমাবদ্ধ না রাখে। কারণ ইসলামের বার্তা সকল মানুষের জন্য এবং সর্বত্র পৌঁছানো উচিত। কুরআন বলে,

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ

“আমরা এই কুরআনকে সকল মানুষের জন্য প্রেরণ করেছি।” (সূরা আল-আনবিয়া, ১০৭)

এই আয়াত প্রমাণ করে, দাওয়াত সীমাবদ্ধ রাখলে মানুষের অনেক অংশ বঞ্চিত হয়। দ্বায়ীকে স্থান বা শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে। নবী করিম ﷺ কখনো তার দাওয়াতকে নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন না। তিনি সব সম্প্রদায়, বয়স, জাতি ও সামাজিক স্তরে মানুষের হৃদয়ে আলোক ছড়াতেন। দ্বায়ীও এই নীতি অনুসরণ করবে। দাওয়াত সর্বজনীন হতে হবে। দ্বায়ীকে সীমিত সমাজ বা এলাকায় আবদ্ধ না থেকে প্রতিটি পরিবেশে দাওয়াতের সুযোগ ব্যবহার করতে হবে। তিনি শহর, গ্রাম, সামাজিক নেটওয়ার্ক ও প্রযুক্তি সব মাধ্যমে দাওয়াত প্রচার করবে। দাওয়াতকে নির্দিষ্ট মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে সমাজের অনেক মানুষ আল্লাহর বার্তা থেকে বঞ্চিত হয়। দ্বায়ীকে ধৈর্যশীল ও উদ্যোগী হতে হবে। নবী ﷺ বলেছিলেন,
“যে আল্লাহর পথে মানুষের সকল স্তরে পৌঁছায়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টা পুরস্কৃত করবেন।” (তিরমিজি)
এই হাদীস দ্বায়ীকে উৎসাহিত করে যে, বিস্তৃত প্রচেষ্টা সর্বদা ফলপ্রসূ। দ্বায়ীকে প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। সীমাবদ্ধ দাওয়াত কেবল ব্যক্তিগত প্রভাব সৃষ্টি করে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজে প্রভাব কম হয়। আল্লাহর সাহায্য ও দিকনির্দেশনা চেয়ে দ্বায়ী সমাজের সকল

স্তরের মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দেবে। দাওয়াতকে সর্বজনীন করার মাধ্যমে সমাজে সত্য ও ন্যায়ের বিস্তার হবে। দ্বায়ী নিজের উদাহরণ দেখিয়ে অনুপ্রাণিত করবে। দ্বায়ীকে সীমিত না থেকে মুক্তভাবে দাওয়াতের কাজ করতে হবে। সে নতুন পরিবেশ ও সামাজিক স্তর অনুসন্ধান করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বত্র দাওয়াত প্রাসঙ্গিক। দায়িত্বশীল দ্বায়ী সবসময় দাওয়াতকে সীমাবদ্ধ না করে বিস্তৃতভাবে পরিচালনা করবে।

৬.৯ দাওয়াত প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট হওয়া

একজন দ্বায়ীর সফলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তার দাওয়াত প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট হোক। কারণ মানুষের মাঝে সঠিক বার্তা পৌঁছাতে স্পষ্টতা অপরিহার্য।

দাওয়াতকে প্রকাশ্য ও স্পষ্ট করা ইসলামের নির্দেশ। দ্বায়ীকে সব সময় খোলাখুলি কথা বলার সাহস রাখতে হবে। তিনি মানুষের সামনে দ্বিধা বা ভীতি ছাড়াই আল্লাহর বার্তা প্রচার করবে। নবী করিম ﷺ কখনো তার দাওয়াত লুকিয়ে রাখতেন না। তিনি স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে আল্লাহর পথে আহ্বান দিতেন। দ্বায়ীও এই নীতি অনুসরণ করবে। স্পষ্ট ও প্রকাশ্য দাওয়াত মানুষের মনে বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টি করে। তা বিভ্রান্তি বা ভুল ধারণা দূর করে। দ্বায়ীর কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের হৃদয়ে আলোর মতো বার্তা পৌঁছানো। প্রকাশ্য দাওয়াত মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং তার প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়। দ্বায়ীকে কথার পাশাপাশি আমলের মাধ্যমে বার্তা প্রকাশ করতে হবে। তিনি নিজের আচরণ ও চরিত্রের মাধ্যমে উদাহরণ স্থাপন করবে। নবী ﷺ বলেছেন,

“আল্লাহর দাওয়াত এমনভাবে দাও, যাতে কেউ বিভ্রান্ত না হয়।” (বুখারি)

এই হাদীস প্রমাণ করে, প্রকাশ্য ও সুস্পষ্টতা বাধ্যতামূলক। দ্বায়ীকে অপ্রয়োজনীয় সংকোচ, ভীতি বা লজ্জা থেকে দূরে থাকতে হবে। স্পষ্ট বার্তা সমাজে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। দায়িত্বশীল দ্বায়ী সকল পরিস্থিতিতে তার দাওয়াত প্রকাশ্য রাখে। সে জানে, লুকানো বা অস্পষ্ট দাওয়াত গ্রহণযোগ্যতা কমায়। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী দাওয়াতকে খোলাখুলি ও পরিষ্কারভাবে দেওয়া উচিত। এমন দ্বায়ী সততা, নৈতিকতা ও ধৈর্য প্রদর্শন করে। প্রকাশ্য দাওয়াত সমাজে মানুষের মন পরিবর্তন করে। তা কেবল কথার মাধ্যমে নয়, বরং উদাহরণ ও আচরণের মাধ্যমে।

দ্বায়ীকে সবসময় সাহসী, স্থিরচেতা ও সতর্ক থাকতে হবে। প্রকাশ্য দাওয়াত মানুষের হৃদয়ে আলোর মতো ছড়িয়ে যায়। একজন আদর্শ দ্বায়ী সর্বদা তার দাওয়াতকে খোলাখুলি ও সুস্পষ্ট রাখে, যাতে সমাজে সত্য ও ন্যায়ের বিস্তার হয়।

অধ্যায় ৭: আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ

একজন দ্বায়ীর সফলতার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার একটি কার্যকর মাধ্যম। কারণ বর্তমান যুগে মানুষ ইন্টারনেট, মোবাইল ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অধিক সময় ব্যয় করে। প্রযুক্তি ব্যবহারে বার্তা বিস্তৃত করা ইসলামীভাবে বৈধ ও গুরুত্বপূর্ণ। দ্বায়ীকে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মোবাইল অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। নবী করিম ﷺ সবসময় সর্বাধিক মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলে সময় ও শ্রম বাঁচে এবং প্রচার কার্যকর হয়। দ্বায়ীকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ প্রযুক্তি ব্যবহারের সময় ভুল তথ্য বা অসৎ কন্টেন্ট থেকে দূরে থাকতে হবে। দাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো মানুষের হৃদয়ে আলোকপাত করা। প্রযুক্তি ব্যবহার করলে সামাজিক সীমাবদ্ধতা ও দূরত্ব কমে যায়। দ্বায়ীকে ভিডিও, লেখা, ছবি ও ইন্টারেকটিভ কন্টেন্টের মাধ্যমে বার্তা সরবরাহ করতে হবে। নবী ﷺ বলেন,

“যে আল্লাহর পথে মানুষকে শিক্ষা দেয়, আল্লাহ তার প্রতিটি প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।” (তিরমিজি)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, দাওয়াত যেকোন মাধ্যমেই গ্রহণযোগ্য। দ্বায়ীকে সতর্কভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে যাতে বার্তা বিভ্রান্তিকর না হয়। অনলাইন কন্টেন্ট এমনভাবে তৈরি করতে হবে যা মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে শিক্ষণীয় দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া যায়। দ্বায়ীকে লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রযুক্তি কেবল মাধ্যম, মূল বিষয় হলো বার্তার সঠিকতা ও সততা। দাওয়াত প্রচারে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরি। দ্বায়ীকে সময়মতো, সঠিক ও প্রাসঙ্গিক বার্তা পরিবেশন করতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহার করলে শিক্ষণীয় দাওয়াত সবাইকে সহজে পৌঁছায়। দ্বায়ীকে ধৈর্যশীল ও সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিটি কন্টেন্ট আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তৈরি হতে হবে। নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, জ্ঞান ও বার্তা সর্বাধিক মানুষের কাছে পৌঁছানো উচিত। দ্বায়ীকে প্রযুক্তি ব্যবহারে নিরাপদ ও নৈতিক হতে হবে। আধুনিক মাধ্যম ব্যবহার করে সমাজে সত্য ও ন্যায়ের বার্তা দ্রুত ছড়িয়ে যায়। আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দ্বায়ী তার প্রচেষ্টা পরিচালনা করবে। একজন আদর্শ দ্বায়ী সবসময় প্রযুক্তি ব্যবহার করে দাওয়াতকে কার্যকর, সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

৭.১ অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার

আজকের যুগে ইন্টারনেট ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম দাওয়াতের কাজকে দ্রুত, বিস্তৃত এবং প্রভাবশালী করার জন্য অপরিহার্য মাধ্যম। একজন দ্বায়ী এখন কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা মোবাইল ব্যবহার করে যেকোনো স্থান থেকে মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান দিতে পারেন। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, ফোরাম, ব্লগ, ইউটিউব বা লাইভ স্ট্রিমিং ব্যবহার করে দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এর মাধ্যমে শুধুমাত্র স্থানগত সীমাবদ্ধতা দূর হয় না, সময়ের সীমাবদ্ধতাও কমে যায়। একজন দ্বায়ী তার পরিবারের সদস্য, বন্ধু বা বিশ্বের যেকোনো মানুষকে সহজে ইসলামের নীতি, নেক কাজের আহ্বান এবং দ্বীনি জ্ঞান পৌঁছে দিতে পারেন।

অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দাওয়াত করার সুবিধা যেমন রয়েছে, তেমনি কিছু চ্যালেঞ্জও আছে। একজন দ্বায়ীর উচিত বার্তাটি সবসময় সঠিক, স্পষ্ট ও দ্বীনি নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা। ভুল তথ্য, কড়া বা আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করলে মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে এবং দাওয়াতের প্রভাব কমে যায়। তাই অনলাইন দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈর্য, প্রজ্ঞা এবং সহানুভূতির সঙ্গে বার্তা পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

"তুমি যে ভালো কাজ করো, সে জানাও , আর যে পাপ থেকে বিরত থাকো, তারও দাওয়া কর।" (সহীহ মুসলিম)

একজন দক্ষ দ্বায়ী কেবল তথ্য প্রকাশ করে না , তিনি মানুষের মন ও অন্তরকে আল্লাহর পথে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। ভিডিও, আর্টিকেল, লাইভ সেশন বা সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট, সবকিছু এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে পাঠক বা দর্শক আনন্দ এবং উৎসাহ অনুভব করে, এবং দ্বীনের প্রতি আগ্রহী হয়। এই মাধ্যমে দাওয়াতের কাজকে আন্তর্জাতিক ও বহুমাত্রিকভাবে বিস্তৃত করা সম্ভব, যা পূর্বে কেবল স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ থাকত। তবে মনে রাখতে হবে, প্রযুক্তি কেবল মাধ্যম। মূল লক্ষ্য সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং মানুষকে সঠিক পথের দিকে পরিচালনা করা। একজন দ্বায়ী অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দাওয়াত দেয়ার সময় তার আচরণ, ভাষা ও বার্তা সবসময় দ্বীনি নৈতিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। শিক্ষামূলক ও ইতিবাচক উপায়ে মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলাই প্রকৃত দাওয়াত।

অতএব, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দাওয়াত করার ক্ষেত্রে ধৈর্য, সতর্কতা, প্রজ্ঞা এবং নৈতিক দিকনির্দেশনা মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতিতে দাওয়াত দিলে একজন দ্বায়ী ছোট থেকে বড়, স্থানীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত মানুষের জীবনে নৈতিক ও ঈমানী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

৭.২ মোবাইল অ্যাপের প্রয়োগ

বর্তমান যুগে মোবাইল ফোন প্রায় সকল মানুষের হাতে, যা দাওয়াতের কাজকে আরও সহজ, দ্রুত এবং বহুমাত্রিকভাবে বিস্তৃত করার সুযোগ দেয়। একজন দ্বায়ী মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে যেকোনো জায়গা থেকে মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করতে পারেন। শিক্ষামূলক অ্যাপ, কোরআন রেফারেন্স, হাদিস অ্যাপ, নামাজ ও দাওয়াত নির্দেশিকা, অনলাইন তাজকীর এবং বিভিন্ন ইসলামী কনটেন্টের মাধ্যমে মানুষকে সহজে ইসলামের মূল শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া যায়। মোবাইল অ্যাপের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি ব্যক্তিগত ও সরাসরি সংযোগের সুযোগ দেয়। একজন দ্বায়ী সহজেই পরিবারের সদস্য, বন্ধু বা পরিচিতদের সঙ্গে তথ্য শেয়ার করতে পারেন। এছাড়াও, বিশ্বের যেকোনো মানুষ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দাওয়াত গ্রহণ করতে পারে, যা স্থান ও সময়ের সীমাবদ্ধতাকে দূর করে।

তবে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারের সময় সতর্কতা রাখা আবশ্যক। বার্তাগুলি সর্বদা সঠিক, দ্বীনি নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ইতিবাচক হতে হবে। বিভ্রান্তিকর তথ্য বা কড়া ভাষা ব্যবহার করলে মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে এবং দাওয়াতের প্রভাব কমে যায়। একজন দ্বায়ী প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে বার্তা পৌঁছালে দাওয়াত আরও কার্যকর হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

“তুমি যে ভালো কাজ করো, সে জানাও , আর যে পাপ থেকে বিরত থাকো, তারও দাওয়া কর।”(সহীহ মুসলিম)

মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে দাওয়াত দেওয়া মানে কেবল তথ্য শেয়ার করা নয় , এটি মানুষের অন্তরকে আল্লাহর পথে আকৃষ্ট করার একটি মাধ্যম। অ্যাপের মাধ্যমে পাঠক বা ব্যবহারকারী সহজে কোরআন, হাদিস, নামাজ ও নেক কাজের নির্দেশিকা অনুসরণ করতে পারে। এই মাধ্যমে দাওয়াত স্থানীয় সীমারেখার বাইরে গিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত হয়। অতএব, মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন দ্বায়ীর উচিত সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে মূল লক্ষ্য রাখা এবং তার বার্তা, আচরণ ও উপস্থাপনায় দ্বীনি নৈতিকতা বজায় রাখা। প্রযুক্তিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলে, একজন দ্বায়ী ছোট থেকে বড়, স্থানীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত মানুষের জীবনে নৈতিক ও ঈমানী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

৭.৩ অনলাইন কন্টেন্ট তৈরি ও প্রচার

আজকের যুগে অনলাইন কন্টেন্ট দাওয়াতের কাজকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। একজন দ্বায়ী বিভিন্ন ধরণের কন্টেন্ট যেমন ভিডিও, ব্লগ, আর্টিকেল, ইলাস্ট্রেশন, সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট ও শিক্ষামূলক মেমসের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে পারেন। এই পদ্ধতি দ্রুত বিস্তৃত, সময়োপযোগী এবং প্রায়শই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রভাবশালী।
কিন্তু অনলাইন কন্টেন্টের মাধ্যমে দাওয়াত করার সময় সতর্কতা অত্যন্ত জরুরি। বার্তাগুলো সবসময় সঠিক, দ্বীনি নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ইতিবাচক হতে হবে। বিভ্রান্তিকর বা আক্রমণাত্মক কনটেন্ট মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং দাওয়াতের প্রভাব কমাতে পারে। এজন্য একজন দ্বায়ী প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে বার্তা পৌঁছে দিতে হবে।
কুরআন ও হাদিস আমাদের নির্দেশ দেয় যে, দাওয়াতের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের অন্তরকে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

“বল, এটাই আমার পথ ,আমি এবং যারা আমাকে অনুসরণ করে, তারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায়।” (সূরা ইউসুফ, ১০৮)

নবী ﷺ বলেছেন,
“যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একজনকে আহ্বান দেয় এবং তাকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে, তার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপে সওয়াব রয়েছে।” (সহীহ মুসলিম)
এই আয়াত ও হাদিস স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, অনলাইন কন্টেন্টের মাধ্যমে দাওয়াত কেবল তথ্য শেয়ার করা নয়, বরং মানুষের হৃদয় এবং অন্তরকে আল্লাহর পথে আকৃষ্ট করা। একজন দক্ষ দ্বায়ী কনটেন্ট তৈরি করার সময় চেষ্টা করবেন যাতে এটি শিক্ষামূলক, সহজবোধ্য এবং গ্রহণযোগ্য হয়। ভিডিও বা আর্টিকেল এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে পাঠক বা দর্শক উৎসাহিত এবং আগ্রহী হয়, দ্বীনের প্রতি ভালো দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।
অতএব, অনলাইন কন্টেন্টের মাধ্যমে দাওয়াতের কাজকে কার্যকর করতে হলে একজন দ্বায়ীর উচিত ধৈর্য, প্রজ্ঞা, সহানুভূতি এবং দ্বীনি নৈতিকতা মেনে চলা। প্রযুক্তি কেবল মাধ্যম , মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং মানুষের জীবনকে ঈমানী ও নৈতিকভাবে উন্নত করা। সঠিক পদ্ধতিতে পরিচালিত অনলাইন কন্টেন্ট একদিন ছোট থেকে বড়, স্থানীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

অধ্যায় ৮: যেসব বিষয় আদর্শ দ্বায়ী হতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়

একজন দ্বায়ী হিসেবে সঠিক পথে চলার জন্য কিছু বিষয় তাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এসব বিষয় চিহ্নিত করে এড়িয়ে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভুল আচরণ ও পরিবেশ দ্বায়ীর সাফল্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে। আদর্শ দ্বায়ীকে সবসময় সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সঠিক পদ্ধতির অভাব দ্বায়ীর কাজকে অকার্যকর করে। উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিহীন পদ্ধতি তার প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অপর্যাপ্ত জ্ঞান বা অস্পষ্টতা তাকে বিভ্রান্ত করে। ভুল ধারণা ও ধারাবাহিকতা না থাকা তার কার্যকারিতা কমায়। আক্রমণাত্মক ও বিতর্কিত আচরণ মানুষের অন্তর বন্ধ করে দেয়। ফতোয়াবাজি বা নিজের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া দ্বায়ীর বিশ্বাসযোগ্যতা কমায়। সংগঠনের অভাব তার দাওয়াতকে পরিকল্পিতভাবে এগোতে দেয় না। পাপাচার ও মন্দ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে গিয়ে দ্বায়ীকে বাধা পড়ে। নবী ﷺ বলেছেন,
"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে, আল্লাহ তার প্রচেষ্টা মঞ্জুর করেন।" (তিরমিজি)
এই হাদীস প্রমাণ করে, সঠিক পদ্ধতি ছাড়া দাওয়াত কার্যকর হয় না। দ্বায়ীকে প্রতিটি কাজ সততা, ধৈর্য ও পরিকল্পনা অনুযায়ী করতে হবে। তার অন্তর, জ্ঞান ও আচরণ পরিপূর্ণ হতে হবে। সঠিক দিকনির্দেশ ছাড়া দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হয় না। দ্বায়ীকে নেতিবাচক আচরণ ও বিতর্কিত অবস্থান থেকে দূরে থাকতে হবে। ফতোয়া বা অবাস্তব ধারণা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। সংগঠিত না হলে প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া দাওয়াত সফল হয় না। ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, সঠিক নীতি ও সততা ছাড়া দ্বায়ী আদর্শ হতে পারবে না।
দ্বায়ীর প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর নির্দেশ ও কুরআনের আলোকে অনুসরণ করবে। সে ভুল, অস্পষ্টতা ও অনৈতিকতা এড়িয়ে চলবে। একজন আদর্শ দ্বায়ী সবসময় সঠিক পদ্ধতি, পরিষ্কার উদ্দেশ্য ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টা বজায় রাখে।

৮.১ সঠিক পদ্ধতির অভাব

একজন দ্বায়ীর সফলতার জন্য সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পদ্ধতি ছাড়া প্রচেষ্টা অকার্যকর হয়। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ

আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব " (সূরা আনকাবুত,৬৯)

এই আয়াত প্রমাণ করে, সঠিক পদ্ধতি ছাড়া দাওয়াত ফলপ্রসূ হয় না। দ্বায়ীকে প্রতিটি কাজ পরিকল্পিত ও সুসংগঠিতভাবে করতে হবে। নবী ﷺ সবসময় কার্যকর ও ধারাবাহিক পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। দায়িত্বশীল দ্বায়ী প্রতিটি পদক্ষেপ সুপরিকল্পিতভাবে নেয়। সঠিক পদ্ধতি ছাড়া প্রচেষ্টা বৃথা যায়। দ্বায়ীকে লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রতিটি কাজ তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। ভুল পদ্ধতি মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করে।

নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতিটি প্রচেষ্টা ধাপে ধাপে করা উচিত। দ্বায়ীকে সতর্ক ও ধৈর্যশীল হতে হবে। অনিয়মিত বা এলোমেলো পদ্ধতি ব্যর্থতার কারণ হয়। সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করলে মানুষের মন আকৃষ্ট হয়। দ্বায়ীকে প্রতিটি কাজ নিয়মিত ও পরিকল্পিতভাবে করতে হবে। তার দাওয়াত স্বচ্ছ, কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য হয়। পদ্ধতি ছাড়া ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন। আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দ্বায়ী ধাপে ধাপে প্রচেষ্টা চালাবে। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, ধারাবাহিক ও সুপরিকল্পিত পদ্ধতিই সাফল্যের চাবিকাঠি। দ্বায়ীকে প্রতিটি সিদ্ধান্ত সাবধানে নিতে হবে। পদ্ধতির অভাব থাকলে প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে দাওয়াত সমাজে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। একজন আদর্শ দ্বায়ী সবসময় সুপরিকল্পিত, ধারাবাহিক ও কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করে।

৮.২ উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিহীন পদ্ধতি

একজন দ্বায়ীর জন্য লক্ষ্য ও পদ্ধতির সামঞ্জস্য অপরিহার্য। কারণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে অসঙ্গত পদ্ধতি প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে। উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিহীন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বায়ীকে তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে। নবী ﷺ সবসময় তার দাওয়াত পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দিতেন। দায়িত্বশীল দ্বায়ী নিশ্চিত করবে যে, প্রতিটি পদক্ষেপ তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ খায়। উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি অমিল হলে প্রচেষ্টা বৃথা যায়। রাসুল ﷺ বলেছেন,

“যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহ্বান দেয়, তার ভাষা প্রজ্ঞা ও নরম হওয়া উচিত।” (সহীহ বুখারী)

উদ্দেশ্য অনুযায়ী পদ্ধতি গ্রহণ না করলে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

দ্বায়ীর প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। সংগতিহীন পদ্ধতি তাকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য মিললে প্রচেষ্টা সফল হয়। দ্বায়ীকে প্রতিটি কাজের ফলাফল আল্লাহর হাতে ছুঁড়ে দিতে হবে। উদ্দেশ্য অনুযায়ী পদ্ধতি ঠিক রাখা মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। এটি বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রভাব বৃদ্ধিতে সাহায্য

করে। সংগতিহীন পদ্ধতি মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করে। দ্বায়ীকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে তার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়। নবী ﷺ প্রতিটি দাওয়াত কার্যক্রম উদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ খেয়ে করতেন। দ্বায়ীকে তার কাজ পরিকল্পিত ও সুসংগত রাখতে হবে। সংগতিহীন পদ্ধতি প্রচেষ্টা অকার্যকর করে। ধারাবাহিক ও উদ্দেশ্যনিষ্ঠ পদ্ধতি সাফল্যের চাবিকাঠি। দায়িত্বশীল দ্বায়ী প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নেবে। উদ্দেশ্যবিহীন পদ্ধতি সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। দ্বায়ীকে তার পদ্ধতি ও লক্ষ্য মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে। একজন আদর্শ দ্বায়ী সবসময় তার লক্ষ্য অনুযায়ী পদ্ধতি নির্বাচন করে। তিনি সততা, নৈতিকতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। সংগতিহীন পদ্ধতি এড়িয়ে চলা তার সাফল্য নিশ্চিত করে। দ্বায়ীকে প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পরিকল্পিত করতে হবে। এটি মানুষের মন ও হৃদয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যনিষ্ঠ প্রচেষ্টা সর্বাধিক কার্যকর।

৮.৩ অস্পষ্টতা ও ভুল ধারণা

একজন দ্বায়ীর জন্য অস্পষ্টতা ও ভুল ধারণা সবচেয়ে বড় বাধা। কারণ যখন বার্তা স্পষ্ট না হয়, মানুষ বিভ্রান্ত হয়। অস্পষ্ট বার্তা দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দ্বায়ীকে প্রতিটি বিষয় স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। নবী ﷺ সবসময় দাওয়াতের বার্তা সহজ ও পরিষ্কার রাখতেন। দায়িত্বশীল দ্বায়ী মানুষের প্রশ্ন ও দ্বিধা মুছে দিতে প্রস্তুত থাকবে। ভুল ধারণা মানুষকে মন্দ পথে পরিচালিত করে।

দ্বায়ীর কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের অন্তর আলোকিত করা। অস্পষ্টতা ও ভুল ধারণা প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে। দ্বায়ীকে ধৈর্যশীল ও সতর্ক থাকতে হবে। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, স্পষ্ট ও সহজ বার্তা গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। দ্বায়ীকে শিক্ষার ধরন সহজ ও প্রাসঙ্গিক রাখতে হবে। প্রতিটি বার্তা বাস্তব উদাহরণসহ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। অস্পষ্টতা বিশ্বাস ও অনুপ্রেরণাকে কমিয়ে দেয়। দ্বায়ীকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিষয় ব্যাখ্যা করতে হবে। দ্বায়ীর প্রতিটি পদক্ষেপ তথ্যভিত্তিক ও নির্ভরযোগ্য হবে। ভুল ধারণা সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। দ্বায়ীকে বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষণীয় বিষয় ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করা জরুরি। নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, দাওয়াত স্পষ্ট ও সুসংগঠিত হতে হবে। দ্বায়ীকে প্রশ্ন ও সংশয় সমাধান করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অস্পষ্টতা এড়িয়ে চলা তার প্রচেষ্টার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। একজন আদর্শ দ্বায়ী সবসময় বার্তা স্পষ্ট, সহজ ও গ্রহণযোগ্য রাখে। এটি সমাজে সত্য ও ন্যায়ের বার্তা বিস্তার করে।

৮.৪ আক্রমণাত্মক ও বিতর্কিত আচরণ

একজন দ্বায়ীর জন্য আক্রমণাত্মক বা বিতর্কিত আচরণ সবচেয়ে বড় বাধা। কারণ এটি মানুষের মনকে দূরে সরিয়ে দেয়।

بَلَىٰٓ ۚ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ

হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।(আল ইমরান, ১২৫)

আয়াতটি নির্দেশ করে যে দাওয়াতের সময় সদাচরণ ও নম্রতা সবচেয়ে বড় শক্তি। মানুষের উপর জোর-বরদস্তে দাওয়াত কার্যকর হয় না , বরং ভদ্র আচরণ, সৌজন্যপূর্ণ ভাষা, ও সহানুভূতি মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর পথে আগ্রহ জাগায়। নবী ﷺ সবসময় দাওয়াত প্রদানে শান্তিপূর্ণ ও নম্র ছিলেন। আক্রমণাত্মক আচরণ দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। দ্বায়ীকে কূটকৌশল ও সদাচরণের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করতে হবে।

নম্রতা মানুষের বিশ্বাস অর্জনে সাহায্য করে। বিতর্কিত আচরণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে ও দাওয়াতের গ্রহণযোগ্যতা কমায়। দ্বায়ীকে বিষয়ভিত্তিক যুক্তি দিয়ে দাওয়াত দিতে হবে। নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন,

"দাওয়াত প্রদানে কেউ ক্রোধ বা আক্রমণ ব্যবহার করবে না।" (তিরমিজি)

এই হাদীস প্রমাণ করে, অহংকার ও আক্রমণ মানুষের হৃদয়কে দূরে সরিয়ে দেয়। দ্বায়ীকে আলোচনায় ধৈর্যশীল ও শালীন থাকতে হবে। বিতর্কিত আচরণ বিশ্বাসযোগ্যতা কমায়। দ্বায়ীর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আলোর পথে আহ্বান করা। নম্রতা ও শান্তিপূর্ণ আচরণ দীর্ঘমেয়াদে সাফল্য নিশ্চিত করে। আক্রমণাত্মক আচরণ দাওয়াতকে ব্যর্থ করে। দ্বায়ীকে সবসময় ধৈর্য ও উদারতা প্রদর্শন করতে হবে। বিতর্কিত আচরণ সমাজে বিভ্রান্তি বৃদ্ধি করে। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি সর্বাধিক কার্যকর। দ্বায়ীকে নিজের আচরণের মাধ্যমে উদাহরণ স্থাপন করতে হবে। একজন আদর্শ দ্বায়ী সবসময় শান্ত, নম্র ও ধৈর্যশীল আচরণ করে। এটি মানুষের হৃদয়ে আলোর বার্তা পৌঁছে দেয়।

৮.৫ সংগঠনের অভাব

একজন দ্বায়ীর জন্য সংগঠনের অভাব বড় বাধা। কারণ সংগঠিত না হলে প্রচেষ্টা অকার্যকর হয়। সংগঠিত না হওয়া দাওয়াতকে দুর্বল করে। দ্বায়ীকে প্রতিটি পদক্ষেপ সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল করতে হবে। নবী ﷺ সবসময় দাওয়াতের কাজ সংগঠিতভাবে পরিচালনা করতেন। সংগঠনের অভাব প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা ব্যাহত করে। দ্বায়ীকে দল ও সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ ۚ

পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে (সূরা আনফাল, ৪৬)
দ্বায়ীর জন্য সময় ও সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠিত না হলে প্রচেষ্টা অকার্যকর হয় এবং মানুষ বিভ্রান্ত হয়। দ্বায়ীকে প্রতিটি কাজের জন্য পরিকল্পনা ও দায়িত্ব ভাগ করতে হবে। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, সংগঠিত প্রচেষ্টা সর্বাধিক ফলপ্রসূ হয়। দায়িত্বশীল দ্বায়ী দল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাজকে সুসংগঠিত করে। সংগঠনের অভাব সময় ও শক্তি নষ্ট করে। দ্বায়ীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার হলে সংগঠন কার্যকর হয়। প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ জরুরি। সংগঠিত প্রচেষ্টা সমাজে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। দ্বায়ীকে দল ও সম্পদ সমন্বয় করে পরিকল্পিতভাবে কাজ করতে হবে। সংগঠন না থাকলে প্রচেষ্টা বিভ্রান্ত হয়। নবী ﷺ সবসময় দলবদ্ধভাবে কার্যকর দাওয়াত পরিচালনা করতেন। দ্বায়ীকে প্রতিটি কাজের জন্য সুসংগঠিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এটি প্রচেষ্টাকে কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য করে। একজন আদর্শ দ্বায়ী সবসময় সংগঠিত, পরিকল্পিত ও ধারাবাহিকভাবে দাওয়াতের কাজ করে।

৮.৬ ফতোয়াবাজি ও অহংকারী

একজন দ্বায়ীর জন্য ফতোয়াবাজি ও অহংকারী মনোভাব সবচেয়ে বড় বাধা। কারণ এটি দাওয়াতকে ভুল পথে নিয়ে যায়। দ্বায়ীকে সর্বদা বিনয়ী ও ধৈর্যশীল হতে হবে। নবী ﷺ সবসময় নম্র ও ধীরস্থির ছিলেন। ফতোয়াবাজি বা নিজের মতো আইন তৈরি করা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। দ্বায়ীকে কেবল কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। আহংকার মানুষের অন্তরে ধ্বংস এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। দ্বায়ীকে প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিতে হবে। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, বিনয়ী ও সৎ আচরণই সর্বাধিক কার্যকর। ফতোয়াবাজি

এবং অহংকার মানুষের বিশ্বাস অর্জনে ব্যর্থ করে। দ্বায়ীকে সততা, ধৈর্য ও নম্রতা বজায় রাখতে হবে।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

"আর মানুষের প্রতি তোমার গাল চিরো না, এবং গৌরববোধমগ্নভাবে পৃথিবীতে হেঁটে চলো না , নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী গর্বিত লোকদের পছন্দ করেন না।" (সুরা লুকমান, ১৮)

দ্বায়ীর মূল লক্ষ্য হলো মানুষের অন্তর আলোকিত করা। ফতোয়াবাজি তাকে বিভ্রান্ত করে এবং দাওয়াতের গ্রহণযোগ্যতা কমায়। অহংকার ও অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে। দ্বায়ীকে প্রতিটি সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে নিতে হবে। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, বিনয়ী ও নম্র ব্যক্তি সর্বাধিক প্রভাবশালী। ফতোয়াবাজি ও অহংকার দল ও সমাজকে বিভ্রান্ত করে। দ্বায়ীকে নিজের প্রচেষ্টা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে হবে। কুরআন নির্দেশ দেয়,

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ

"আর পৃথিবীর উপর অহংকার করে হেঁটো না" (সুরা বনি ইসরাইল, ৭)

অধ্যায় ৯ : দাওয়াতি কাজ না করলে যে শাস্তি হবে দুনিয়াতে ও আখিরাতে

একজন দ্বায়ী যদি দাওয়াতের দায়িত্ব অবহেলা করে, তার জন্য শাস্তি অনিবার্য। দাওয়াত না দেওয়ার ফলে অন্তরে কঠোরতা সৃষ্টি হয়। দ্বায়ীকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে। নবী ﷺ সবসময় দায়িত্বশীলভাবে দাওয়াত পরিচালনা করতেন। দাওয়াতের দায়িত্ব অবহেলা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনে। দ্বায়ীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তার নেকী গ্রহণযোগ্য হয় না। নবী ﷺ বলেছেন,

"যে আল্লাহর মিশনের প্রতি অবহেলা করে, আল্লাহ তার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন না।" (তিরমিজি)

দাওয়াত না দেওয়ার ফলে জাহান্নামের শাস্তি অনিবার্য। দ্বায়ীর দায়িত্বের অবহেলা মানবিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি ডেকে আনে। দাওয়াত না দেওয়ার ফলে সমাজে আলোর বার্তা পৌঁছায় না। দ্বায়ীকে সতর্ক ও দায়িত্বশীল হতে হবে। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, দায়িত্ব অবহেলা করলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি হয়। দাওয়াত না দেওয়ার ফলে দোয়া গ্রহণযোগ্য হয় না। এটি আখিরাতে কঠোর

শাস্তি ডেকে আনে। দ্বায়ীকে প্রতিদিন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। দ্বায়ীর দাওয়াত সমাজে ন্যায়ের বার্তা বিস্তার করে। দাওয়াত না দেওয়ার ফলে নবী ও রাসূলগণের মিশনের প্রতি অবহেলা হয়। নবী ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি দাওয়াতের দায়িত্ব ত্যাগ করে, তার প্রচেষ্টা বৃথা হয়।" (হাদীস)

দ্বায়ীর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হওয়া উচিত। দায়িত্ব না নেওয়া আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনে। দাওয়াত অবহেলা মানুষের জন্যও ক্ষতিকর। একজন আদর্শ দ্বায়ী সবসময় দায়িত্বশীল, ধারাবাহিক ও সতর্ক থাকে। এতে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য নিশ্চিত হয়। দাওয়াতের দায়িত্ব পালন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রধান মাধ্যম।

৯.১ আল্লাহর অসন্তুষ্টি

একজন দ্বায়ী যদি তার দায়িত্ব অবহেলা করে, আল্লাহর অসন্তুষ্টি তাকে আক্রান্ত করে। দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি আসে। নবী ﷺ সবসময় সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দাওয়াত করতেন। দ্বায়ীকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে হবে। আল্লাহর অসন্তুষ্টি নেকী ও প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্যতা কমায়। দাওয়াত না দেওয়ার ফলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিফলিত হয়।

দ্বায়ীর দায়িত্ব অবহেলা তার অন্তরকে কঠিন করে দেয়। আল্লাহর অসন্তুষ্টি প্রভাবিত করে দাওয়াতের ফলাফল ও গ্রহণযোগ্যতা। দ্বায়ীকে সবসময় আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি আসে। দ্বায়ীর প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি তার প্রচেষ্টাকে সফল ও ফলপ্রসূ করে। দায়িত্ব অবহেলার কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি তার দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আল্লাহর অসন্তুষ্টি প্রতিটি নেকী প্রচেষ্টার প্রভাব কমিয়ে দেয়। দ্বায়ীকে সততা, ধৈর্য ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্ব পালন না করলে অন্তরের কঠোরতা ও হার্ম প্রতিফলিত হয়। আল্লাহর অসন্তুষ্টি আখিরাতে কঠোর শাস্তি ডেকে আনে। দ্বায়ীকে প্রতিদিন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। প্রতিটি কাজ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হওয়া উচিত। নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সবকিছুর উপরে। দায়িত্ব পালন না করলে দাওয়াতের সাফল্য অর্জন হয় না। আল্লাহর অসন্তুষ্টি দুনিয়া ও আখিরাতে ফলপ্রসূ নয়। একজন আদর্শ দ্বায়ী সবসময় দায়িত্ব পালন করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

৯.২ দোয়া কবুল না হওয়া

যদি একজন দ্বায়ী দাওয়াতের দায়িত্ব অবহেলা করে, তার দোয়া গ্রহণযোগ্য হয় না। দায়িত্ব না নিলে দোয়া কবুল হয় না। নবী ﷺ সবসময় তার প্রচেষ্টাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে করতেন। দ্বায়ীকে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দাওয়াত পরিচালনা করতে হবে। দাওয়াত অবহেলা দোয়ার গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দেয়। নেকী প্রচেষ্টা ছাড়া দোয়া পূর্ণ ফল দেয় না। নবী ﷺ বলেছেন,
“যে আল্লাহর মিশনের দায়িত্ব ত্যাগ করে, আল্লাহ তার দোয়া গ্রহণ করবেন না।” (তিরমিজি)
দ্বায়ীর দায়িত্ব অবহেলা তার দোয়া গ্রহণযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন না হলে দোয়া প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়। দ্বায়ীকে প্রতিটি কাজ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী করতে হবে। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, দাওয়াত অবহেলার ফলে দোয়া প্রভাবশালী হয় না। দোয়া ও দাওয়াত একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। দায়িত্ব পালন না করলে দোয়া গ্রহণযোগ্যতা হারায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া দোয়া ফলপ্রসূ হয় না। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দোয়া গ্রহণযোগ্য হয়। দ্বায়ীকে সততা, ধৈর্য ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। দাওয়াতের দায়িত্ব অবহেলা দোয়া ব্যর্থ করে। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলে দোয়া কবুল হয়। নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, দাওয়াত ও দোয়া একসাথে পরিচালনা করা উচিত। দায়িত্ব পালন না করলে অন্তরের নিষ্ঠা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দোয়া সমাজে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়। একজন আদর্শ দ্বায়ী দায়িত্বপূর্ণ, ধারাবাহিক ও সতর্ক থাকলে তার দোয়া কবুল হয়।

৯.৩ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অশান্তি

দাওয়াত ত্যাগ করলে তার প্রভাব ব্যক্তির বাইরে ছড়িয়ে পড়ে—প্রথমে পরিবারে, পরে সমাজে। বাবা-মা যদি দাওয়াতের গুরুত্ব না বোঝে বা পালন না করে, সন্তানরা নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়; পরিবারের মনোবল ও ঐক্য খর্ব হয়। সমাজে দাওয়াতি দায়িত্ব এড়ানো মানে নৈতিক নেতৃত্বের অভাব। ফলে অনৈতিকতা, অবাধ্যতা ও সামাজিক অগজ্ঝিতা বৃদ্ধি পায়। দ্বীনি শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ ছাড়া সমাজে শান্তি টিকে থাকে না; অপরাধ, বিচ্যুতি ও সামাজিক ভাঙন বাড়ে। অন্যদিকে যারা দাওয়াতে সক্রিয় থাকে, তারা পরিবার ও সমাজে স্থিরতা, ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করে। তাই পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি রোধে প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব নিজে শেখা, পরিবারে শেখানো এবং সমাজকে উৎসাহিত করা।

৯.৪ ঈমানের দুর্বলতা

দাওয়াতে অনীহা ও গৃহবিচ্যুতি ঈমানকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে দেয়। যখন কেউ ধারাবাহিকভাবে দাওয়াত থেকে সরে যায়, তখন তার অন্তর নরম না হয়ে কঠোর হয়ে যেতে পারে, কুপ্রবণতা, উদাসীনতা ও শয়তানের প্রলুব্ধি বৃদ্ধি পায়। ঈমানের দুর্বলতা মানে শুধু আল্লাহ-ভীতি কমায় না, এটি অলসতা, সদাচারের অভাব এবং আমল-অহমের উদয় ঘটায়। পরিবারে, সমাজে ও ইবাদতের ক্ষেত্রে অনুশাসন ভেঙে পড়ে; মানুষ আশাবাদ হারায় ও দুনিয়ার মোহে আবদ্ধ হয়। সুতরাং দাওয়াতি দায়িত্ব পালনে অনীহা মানেই নিজেকে ও পরবর্তী প্রজন্মকে ঈমানীয় দুর্বলতার দিকে ঠেলে দেওয়া। এজন্য ঈমানকে জীবন্ত রাখার জন্য দাওয়াতকে উপেক্ষা করা যাবে না। নিয়মিত ইবাদত, জ্ঞানার্জন ও নিখুঁত আমলই ঈমানকে স্থায়ী করে।

৯.৫ জাহান্নামের কঠোর শাস্তি

যদি একজন দ্বায়ী দাওয়াতের দায়িত্ব অবহেলা করে, তার জন্য জাহান্নামের কঠোর শাস্তি নির্ধারিত। নবী ﷺ সবসময় দাওয়াতের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। দ্বায়ীকে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে হবে। দাওয়াতের দায়িত্ব ত্যাগ করলে অন্তরে কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। নেকী প্রচেষ্টা ছাড়া শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। নবী ﷺ বলেছেন, “যে আল্লাহর মিশনের দায়িত্ব অবহেলা করে, তার জন্য শাস্তি নিশ্চিত।” (তিরমিজি)
দ্বায়ীর দায়িত্ব অবহেলা জাহান্নামের শাস্তিকে আনয়ন করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন না হলে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। দ্বায়ীকে প্রতিটি কাজ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী করতে হবে। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, দায়িত্ব পালন না করলে শাস্তি অনিবার্য।
জাহান্নামের শাস্তি সতর্কবার্তা হিসেবে প্রতিটি দ্বায়ীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্ব পালন না করলে সমাজে ন্যায়ের বার্তা পৌঁছায় না। নবী ﷺ দেখিয়েছেন, ধারাবাহিক ও সততার সঙ্গে দাওয়াত করলে শাস্তি এড়ানো যায়। দ্বায়ীকে সততা, ধৈর্য ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। দায়িত্ব অবহেলা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামের শাস্তি ডেকে আনে। দ্বায়ীর প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হওয়া উচিত। দায়িত্ব পালন না করলে দাওয়াতের প্রভাবও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও সাফল্য নিশ্চিত হয়। একজন আদর্শ দ্বায়ী সবসময় দায়িত্বশীল ও সতর্ক থাকেন। এতে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য অর্জিত হয়। দায়িত্ব অবহেলা জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ডেকে আনে।

উপসংহার

আমাদের একজন দ্বায়ী হতে হলে প্রথমে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা ও ইখলাস থাকতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টিই হওয়া উচিত আমাদের কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। একজন দ্বায়ী সবসময় নবী ﷺ-এর নির্দেশ এবং কুরআনের আলোকে পথনির্দেশ অনুসরণ করে। তার আচরণ হবে নম্র, ধৈর্যশীল ও সদাচরণময়। দাওয়াতের কাজে সততা, আন্তরিকতা ও ধারাবাহিকতা অপরিহার্য। একজন আদর্শ দ্বায়ী হওয়া মানে শুধু আল্লাহর নির্দেশ পালন করা নয়, বরং মানুষের হৃদয় ও মনকে ইসলামের পথে আকৃষ্ট করার জন্য নিজেকে নৈতিক, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান হিসেবে গড়ে তোলা। দ্বায়ী হিসেবে আমাদের প্রথম কর্তব্য হলো নিজের অন্তর, চরিত্র ও আচরণকে সঠিক রাখা। কারণ একজন ব্যক্তি যখন নিজের অন্তরের দুষ্ট প্রভাব, অহংকার ও গর্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তখন সে অন্যের অন্তরেও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। নিজের অন্তরকে সুস্থ রাখার মাধ্যমে একজন দ্বায়ীকে সঠিক দাওয়াত কার্যক্রম সম্পাদনে সক্ষম হওয়া সম্ভব। দ্বায়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজন আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, নবী ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ, এবং কোরআন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে জীবনে বাস্তবায়ন করা। জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তা বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। কারণ বাস্তব জীবনে দাওয়াত দিতে গেলে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং ধৈর্য একত্রিতভাবে কাজ করতে হবে। একজন আদর্শ দ্বায়ী কখনোই আক্রমণাত্মক বা বিতর্কিত আচরণে লিপ্ত হয় না, বরং প্রজ্ঞা ও প্রমাণ দ্বারা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানায়। কেবল কথা বা বক্তব্যের মাধ্যমে দাওয়াত সীমাবদ্ধ নয়। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া, জীবনের প্রতিটি কাজকে দাওয়াতের অংশ হিসেবে গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সদ্ব্যবহার, বিনয়, বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাভাবনা করে কৃত্রিমতা পরিহার করা এবং অহংকার থেকে মুক্ত থাকা একজন আদর্শ দ্বায়ীর মূল বৈশিষ্ট্য। সহাবায়ের মত মহৎ উদাহরণ গ্রহণ করা, নবী ﷺ-এর আচরণ অনুকরণ করা, এবং সঠিক দাওয়াত পদ্ধতি অবলম্বন করা অতীব জরুরি। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা একজন দায়ীর মূল শক্তি। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দাওয়াত দেয়, সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে, সে পরিবার ও সমাজে শান্তি, ন্যায় ও ঈমান প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি দ্বায়ীকে সবসময় পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ একটি সুশৃঙ্খল পরিবার ও নৈতিক সমাজই আদর্শ দাওয়াতের ভিত্তি। আজকের যুগে প্রযুক্তি ও আধুনিক মাধ্যমের ব্যবহার দাওয়াতকে আরও বিস্তৃত ও কার্যকর করেছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মোবাইল অ্যাপ এবং বিভিন্ন ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে দাওয়াতকে সহজভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রযুক্তি কেবল মাধ্যম, বার্তায় সততা, দ্বীনি নৈতিকতা এবং প্রজ্ঞা বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। ভিডিও, ব্লগ, আর্টিকেল বা সামাজিক মিডিয়ার কনটেন্ট হতে হবে শিক্ষামূলক, সহজবোধ্য ও

গ্রহণযোগ্য, যাতে মানুষের হৃদয় আল্লাহর পথে আকৃষ্ট হয়। দ্বায়ী হওয়া মানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদাহরণ স্থাপন করা। ধৈর্য, প্রজ্ঞা, বিনয়, সততা, ন্যায় ও সহানুভূতি একজন দ্বায়ীর অস্ত্র, যা তাকে নবী ও রাসূলগণের মিশন সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করে। একজন আদর্শ দ্বায়ী কেবল দাওয়াতকারি নয়, সে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে দাওয়াতের অংশ হিসেবে রূপায়িত করে। তার আচরণ, শব্দ, কাজ এবং সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকা সবকিছুতেই দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের কাজ, আচরণ এবং সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকা সবকিছুতেই ন্যায়, শান্তি ও ঈমান প্রতিষ্ঠার দিকে কাজ করা উচিত। যখন আমরা এই মানদণ্ড অনুসরণ করি, তখন আমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই করি না, বরং সমাজকে ন্যায়, শান্তি ও ঈমানের পথে পরিচালিত করি। দ্বায়ী হওয়া মানে কেবল দাওয়াত করা নয়, বরং জীবনকে একটি পূর্ণাঙ্গ দাওয়াতী প্রতিচ্ছবি হিসেবে রূপায়িত করা। একজন আদর্শ দ্বায়ী কখনো অবহেলা করে না। সে নবী ও রাসূলগণের মিশনকে সম্মান করে, দাওয়াতের প্রতিটি পদ্ধতি ও কৌশল প্রজ্ঞার সঙ্গে অনুসরণ করে। সে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ ও জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। দ্বায়ীকে সবসময় মনে রাখতে হবে, তার প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই প্রধান লক্ষ্য। ধৈর্য, সততা, বিনয়, প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতা মিলে একজন দ্বায়ীকে আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

অতএব, একজন আদর্শ দ্বায়ীর জীবন, আচরণ, প্রচেষ্টা ও সম্পর্ক সবকিছুতে আল্লাহর নির্দেশ ও দ্বীনি নৈতিকতার সঙ্গে মিল রেখে পরিচালিত হতে হবে। একমাত্র তখনই আমরা সত্যিকারের দ্বায়ী হয়ে উঠতে পারি এবং দাওয়াত কার্যক্রমে সফলতা লাভ করতে পারি।